৩। হাদীছ ঃ—আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট অহী আসার ভূমিকা ও প্রাথমিক সূচনা আরম্ভ হয় ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন আকারে—স্বপ্নে তিনি যাহা দেখিতেন ঠিক তাহাই দিবালোকের মত প্রকাশ পাইত।* কিছুকাল এই অবস্থা চলার পর নিজ হইতেই হযরতের অন্তরে লোকালয় হইতে সংস্রবহীন হইয়া নির্জনে থাকার প্রেরণা উদিত হইল। তিনি (হেরা) নামক পর্বত গুহায় (মক্কা শহরের লোকালয় হইতে তিন মাইল দূরে) যাইয়া নির্জনে বাস করিতে লাগিলেন। তিনি খাইবার জন্য প্রত্যহ বাড়ী আসিতেন না, পানাহারের জন্য সামান্য কিছু সম্বল লইয়া যাইতেন এবং তথায় একাদিক্রমে অনেক রাত্রি এবাদত বন্দেগীতে নিরত থাকিয়া যাপন করিতেন। অনেক দিন পর একবার বিবি খাতিজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন এবং আবার ঐরূপ একসঙ্গে অনেক রাত্রি এবাদত-বন্দেগীতে রত হইবার জন্য কিছু পানাহারের সম্বল সঙ্গে লইয়া যাইতেন। এইভাবে তিনি হেরা পর্বত গুহায় নির্জনে আল্লার ধ্যান ও এবাদতে মগ্ন থাকাকালে হঠাৎ একদিন হেরা গুহার ভিতরেই তাঁহার নিকট প্রকৃত সত্য আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিল—আল্লার তরফ হইতে জিব্রিল ফেরেশতা অহী (আল্লার বাণী) বহন করিয়া প্রকাশ্যভাবে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সম্মুখে দেখা দিলেন এবং বলিলেন, আপনি পড়ুন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তরে বলিলেন—আমি ত পড়া শিখি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন—তখন সেই ফেরেশতা (হযরত জিব্রিল (আঃ)) আমাকে শক্ত করিয়া ধরিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং আলিঙ্গনের মধ্যে আমাকে এমন শক্তভাবে চাপ দিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার মত) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। অতঃপর তিনি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া দ্বিতীয়বার বলিলেন—আপনি পড়ুন। আমি প্রথম বারের মতই বলিলাম, আমি ত কখনও পড়ার অভ্যাস করি নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলেন—তখন ঐ ফেরেশতা পুনরায় দ্বিতীয়বার আমাকে শক্ত করিয়া ধরিলেন এবং এমন জোরে আলিঙ্গন করিলেন যে, আমার (প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার ন্যায়) কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। তারপর আমাকে ছাড়িয়া দিয়া তৃতীয়বার বলিলেন, আপনি পড়ুন। আমি (এইবারও) বলিলাম, আমি ত কোন দিন পড়া শিখি নাই। তিনি তৃতীয়বার আমাকে আলিঙ্গন করিয়া চাপিয়া ধরিলেন* এবং ছাড়িয়া দিয়া এই আয়াত পাঠ করিলেন।

---

* এই অবস্থা হেরা পর্বতের গুহায় নির্জন বাসের ঘটনার ছয় মাস পূর্ব হইতে আরম্ভ হয়। এর পূর্বেও কোন কোন ঘটনা সময় সময় প্রকাশ পাইত। মোসলেম শরীফের একটি হাদীছে বর্ণিত আছে, সময় সময় রসুলুল্লাহ (দঃ) গায়েবী আওয়াজ শুনিতে পাইতেন ও আলো দেখিতেন। রাস্তায় চলার সময় গাছপালা তাঁহাকে ছালাম করিত। রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন—আমি এখনও মক্কায় সেই সব গাছপালাগুলিকে চিনি যেগুলি আমাকে নবুয়তের পূর্বে সালাম করিত।

* এইরূপে আলিঙ্গনের দ্বারা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের ভিতরে ফয়েজ এবং আধ্যাত্মিক শক্তি আসিতেছিল। তাই তৃতীয়বার চাপিয়া ধরিয়া ছাড়িয়া দিলে তিনি পড়িতে পারিলেন; পড়াও যেমন তেমন পড়া নয়—মানে, মতলব, হকিকত, গুরুত্ব মূলতত্ত্ব সহ পড়া।

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ - خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اِقْرَأْ وَرَبُّكَ
الْاَكْرَمُ - الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ - عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ -**

** প্রথম বারে এই ছুরার উক্ত পাঁচটি আয়াতই নাযেল হয়। আয়াত কয়টির অর্থ এই :— আপনি আপনার সেই মহাপ্রভু পালনকর্তার নাম লইয়া পড়ুন, (নিজ শক্তিতে নয়; সর্বশক্তির আকর যিনি তাঁহার নামের বরকতে আপনার মধ্যে শক্তির সঞ্চার হইবে।) যিনি সারা বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন, বিশেষত: তিনি মানুষের মত জ্ঞানে গুণে পরিপূর্ণ এত উচ্চদরের জীবনকে অতি নিকৃষ্ট পদার্থ জমাট রক্তপিণ্ড হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন। আপনি পড়ুন; আপনার প্রভু দয়ার সাগর, অত্যন্ত দয়ালু (তিনি আপনার সাহায্য করিবেন; মানুষ কিছুই জানিত না) তিনিই (বুদ্ধিহীন, বাকশক্তিহীন, জীবনীশক্তি বিহীন) কলমের মাধ্যমে মানুষকে জ্ঞান দান করিয়াছেন।

আপনি বুদ্ধি-বিবেক, জীবনীশক্তি সব কিছু রাখেন। আপনাকে জ্ঞান ও পড়ার ক্ষমতা তিনি নিশ্চয় দিতে পারিবেন; সেই শক্তি লাভের সূত্ররূপে সেই মহাপ্রভুর মহান নামের বরকত ও অছিলা গ্রহণ করত: পড়িবার জন্য প্রস্তুত হউন; এখন হইতে যত কিছু আপনার প্রতি অবতীর্ণ হইবে সবই পড়িবার জন্য প্রস্তুত ও সাহসী হউন। ভবিষ্যতে আর কোন কিছু পড়িতে সাহস হারা হইবেন না। শুধু পড়াই নয়, প্রতিটি কর্তব্য কাজে মহাপ্রভুর নামের অছিলায় তাঁহার সাহায্য প্রার্থনার অমোঘ ব্যবহার করত: সাহসী হইয়া দাঁড়াইবেন।

প্রকাশ থাকে যে, প্রথম তিনবার ফেরেশতার আহ্বান—"আপনি পড়ুন" সেখানেও আরবী শব্দ "একরা" ছিল; উহা মূল অহী তথা কোরআনের আয়াতভুক্ত ছিল না; উহা ছিল ফেরেশতার কথা। উক্ত তিনবারের "একরা—পড়ুন" ক্রিয়াপদের কর্মপদই ছিল চতুর্থবারে পঠিত আয়াতখানা। আর এই আয়াতে যে "একরা" রহিয়াছে উহা আল্লার কালাম—কোরআনের অংশ; এই ক্রিয়াপদের কর্মপদ হইল—যত কিছু পড়ার মত তোমার সম্মুখে আসিবে। উপস্থিত রসুলকে সম্বোধন করিয়া পড়ায় অক্ষমতা প্রকাশের ঘটনা লক্ষ্যে পড়কে দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করত: মানব গোষ্ঠীকে বলা হইয়াছে, কোন কর্তব্য কাজে সাহস হারা না হইয়া মহাপ্রভুর সূত্রে তাঁহার নিকট সাহায্য প্রার্থনার অসিলা ধরিয়া কাজ আরম্ভ করিবে। ছোট বড় প্রত্যেক কাজেই তাহা করিবে, কারণ প্রত্যেক কাজেই প্রভুর সাহায্য আবশ্যক। পবিত্র কোরআনের এই উপদেশ কেয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। একটি দৃষ্টান্ত—এক ব্যক্তিকে তাহার মুরব্বির তরফ হইতে লিপি পৌছাইবার সময় আপনি বলিলেন, পড়। উক্ত লিপিতে লেখাছিল, সর্বদা মনোযোগের সহিত পড়। আপনার আহ্বান—"পড়" এবং লিপিতে লেখা উপদেশ—"মনোযোগের সহিত পড়" অর্থাৎ সর্বদা মনোযোগের সহিত পড়িবা; উভয় "পড়" শব্দের তাৎপর্যে যে ব্যবধান তদ্রূপ ব্যবধানই রহিয়াছে জিব্রিল ফেরেশতার আহ্বান—"পড়ুন" এবং আল্লাহ তায়ালার কালামের অংশ—"মহাপ্রভুর নামে পড়ুন"—এই উভয় "পড়ুন" এর মধ্যে। আরও সরল দৃষ্টান্ত—শিক্ষক ছাত্রকে বলে, পড়—একরা বিস্মে রাব্বেকা "মহা "প্রভুর নাম লইয়া পড়।" এই উভয় "পড়"-এর মধ্যে যে পার্থক্য তদ্রূপই আলোচ্যে স্থলে।

এই পাঁচটি আয়াত (মুখস্থ ও হৃদয়ঙ্গম করিয়া) লইয়া রসুলুল্লাহ (দঃ) বাড়ী ফিরিলেন। যে অবস্থা হইয়াছে তাহাতে এখনও তাঁহার হৃদয়যন্ত্র থর থর করিয়া কাঁপিতে ছিল+। তাই তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া (গৃহ-সঙ্গিনী পতি সর্বস্ব প্রাণ) খাদিজার কাছে আসিলেন এবং (জ্বরাক্রান্তির আতঙ্কগ্রস্তের ন্যায়) বলিলেন—আমার গায়ে কম্বল দাও। খাদিজা (রাঃ) কম্বল আনিয়া গায়ে দিলেন। কিছু সময় পর ঐ জ্বর-জ্বর ভাব এবং ভয়-ভয় ভাব চলিয়া গেল। অতঃপর হযরত (দঃ) খাদিজাকে সব বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিলেন। হযরত (দঃ) (বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মস্ত বড় ভারি বোঝা তাঁহার উপর চাপান হইবে বোধ হইতেছে, তাই তিনি বলিলেন, আমার ভয় হইতেছে—আমার জীবনে কুলাইবে কি না? আমার শরীরে সহ্য হইবে কি না, না জীবন বাহির হইয়া যাইবে, স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যাইবে। খাদিজা (রাঃ) (অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না ছিলেন এবং রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রায় বাল্যকাল হইতেই জানিতেন এবং দীর্ঘ পনর বৎসর হইতেও একেবারে অন্তরঙ্গ সঙ্গিনীরূপেই বসবাস করিয়াছেন। তিনি) সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, كلا والله ما يخزيك الله ابدا খোদার কসম, কিছুতেই নয়, আল্লাহ আপনাকে কিছুতেই অপদস্ত করিবেন না। (নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে সাহায্য করিবেন—আপনাকে জয়যুক্ত করিবেন। কেননা মানবতার চরম উৎকর্ষের মূল সাতটি খাছলতই আপনার মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান আছে। যথা—)

১। انك لتصل الرحم—আপনি আত্মীয়-স্বজনদের সহিত সদ্ব্যবহার করিয়া আত্মীয়-তার হক আদায় করতঃ আত্মীয়তা রক্ষা করিয়া চলেন। আত্মীয়দের সঙ্গে কখনও খারাপ ব্যবহার করেন না এবং সম্পর্ক ছেদন করেন না *

+ এই অবস্থায় কম্পন বা ভয় কোন অস্বাভাবিক বস্তু নয়। হঠাৎ অতি বড় একটি বোঝার চাপ তাঁহার উপর পড়িয়াছে—জিব্রিল ফেরেশতার সহিত মোলাকাত; তিনি আকাশ ও পৃথিবীর সমস্ত ফেরেশতাগণের শ্রেষ্ঠ, স্বয়ং সর্বশক্তিমান অসীম অফুরন্ত শক্তির আকরের সঙ্গে যোগাযোগের দ্বারা অত্যাধিক ফয়েজের চাপ, সর্বোপরি ভবিষ্যতের গুরু দায়িত্ব ভারের চাপ—এতগুলি চাপ হঠাৎ এক সঙ্গে। কাজেই রক্ত মাংসের শরীরে জ্বর, কম্পন ইত্যাদি না হইয়া পারে না। রসুলুল্লার আধ্যাত্মিক শক্তি যত বড়ই হউক না কেন দেহটি ত মানুষেরই দেহ ছিল।

* সাধারণতঃ লোক সমাজে মামু-ভাগ্নে, চাচা-ভাতিজা, চাচাত ভাইদের সঙ্গেই বিষয় সম্পত্তির সহিত জড়িত থাকার কারণে ঝগড়া-বিরোধ মনোমালিন্য বেশী হয়। কিন্তু হযরত রসুলুল্লার শিক্ষা এই যে, এই সমস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা জন্মান যাইবে না। তাদের সঙ্গে মিলন ও সৌহার্দ বজায় রাখিতে হইবে। এই স্বভাব হযরতের নবুয়ত পাওয়ার পূর্বেই ছিল, তার প্রমাণ খাদিজার এই সাক্ষ্য। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা ভিন্ন কথা এবং স্বজন-প্রীতি যাহা অতীব দূষণীয় তাহা হইতেছে এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া, আমানতের খেয়ানত করিয়া, বিচার ক্ষেত্রে অথবা ষ্টেটের বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের চাকুরী পদ বা টাকা-পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার দিকে লক্ষ্য না করিয়া পক্ষপাতিত্ব করা, ইহা হারাম। পক্ষান্তরে নিজের ব্যক্তিগত জান মাল দিয়া যথাসম্ভব আত্মীয়গণের হক আদায় করা জরুরী এবং ফরয।

২। وتصدق الحديث—আপনি সদা সত্যবাদী; মিথ্যা কথা বলেন না।*

৩। وتؤدى الامانة—আপনি চিরকাল পূর্ণ মাত্রায় অতিশয় বিশ্বাসী আমানতদার; আমানতের খেয়ানত আপনি কখনও করেন নাই। (ব্যক্তিগত লেনদেনের আমানত, পারিবারিক আচার-ব্যবহারের আমানত, সামাজিক বিচার অথবা খেদমত ও সেবার আমানত সবই উদ্দেশ্য।)

৪। وتحمل الكل—যে সব অনাথ অক্ষম এতীম বিধবা অন্ধ খঞ্জ আছে, আপনি তাহাদের বোঝা বহন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন করার ক্ষমতা নাই তাহাদের রুজির, খাওয়া-পরার ও থাকার বন্দোবস্ত আপনি করিয়া দেন।

৫। وتكسب المعدوم—আপনি বেকার সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহাদের উপার্জন ক্ষমতা আছে কিন্তু কাজ না পাওয়ার কারণে অভাবগ্রস্ত; আপনি তাহাদের কাজের ব্যবস্থা উপার্জনের সংস্থান করতঃ তাহাদের সাহায্য করিয়া থাকেন।

৬। وتقرى الضيف—আপনি অতিথি-সেবা, মেহমানের খেদমত করিয়া থাকেন।

৭। وتعين على نوائب الحق—আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগক্ষেত্রে দুস্থ জনগণের সাহায্য কল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছেন।

মানবতার উৎকর্ষ এই গুণগুলি যেই মানুষের মধ্যে আছে সেই মানুষ সফলকাম না হইয়া পারে না, আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে কখনও অকৃতকার্য্য করেন না।

খাদিজা (রাঃ) এইরূপে সান্ত্বনা দিয়া হযরতকে লইয়া বংশের বৃদ্ধ মুরব্বি চাচাত ভাই অরাকা ইবনে নওফেলের নিকট গেলেন। অরাকা সত্যান্বেষী সুজ্ঞানী লোক ছিলেন, অতি বৃদ্ধ হওয়ায় অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। জাহেলিয়াতের যমানাতেই তিনি সত্য ধর্মের তালাশে সিরিয়া দেশে যাইয়া ঈসায়ী ধর্মীয় এক খাঁটী আলেমের নিকট খাঁটী ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এব্রানী ভাষা লিখিতেন এবং এব্রানী হইতে ইঞ্জিল কেতাবের আরবী তরজমাও করিতেন। (তাহাতে পূর্বের আসমানী কেতাব সমূহে তাঁহার দক্ষতা ও পারদর্শিতা ছিল। তিনি নবীগণের প্রতি অহী ও অহীবাহক ফেরেশতা জিব্রিলের বিষয় জানিতেন।) খাদিজা (রাঃ) অরাকাকে বলিলেন, হে চাচা-পুত্র ভ্রাতা! আপনার ভাই-পো কি বলেন একটু শুনুন। খাদিজা (রাঃ) ঘটনার কিছু বর্ণনাও দিলেন। অতঃপর অরাকা হযরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন। আপনি কি দেখেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) যাহা কিছু দেখিয়াছেন সমস্ত ঘটনা অরাকাকে খুলিয়া বলিলেন। অরাকা বলিলেন, এ-ত সেই মঙ্গলময় আল্লার দূত জিব্রিল ফেরেশতা—যাঁহাকে আল্লাহ মুছা আলাইহেচ্ছালামের উপর অবতীর্ণ করিয়াছিলেন। হায় আফছুছ! যদি সেদিন আমি যুবক হইতাম—যেদিন আপনি আল্লার বাণী প্রচার করিবেন। হায় আফছুছ; যদি সেদিন আমি জীবিত থাকিতাম—যেদিন আপনার দেশবাসী আপনাকে দেশান্তরিত করিয়া ছাড়িবে। শেষের বাক্যটি শুনিয়া হযরত স্তম্ভিত হইয়া বলিলেন, কি?

* এই বাক্যটি বোখারী শরীফের ৭৪০ পৃষ্ঠায় এবং পরবর্তী বাক্যটি ফতহুলবারী কেতাবে উল্লেখ আছে।

আমার দেশবাসী আমাকে দেশান্তরিত করিবে। অরাকা বলিলেন—হাঁ, হাঁ,। যে সত্য ধর্ম আপনি প্রচার করিতে আসিয়াছেন এইরূপ সত্য ধর্ম-বাণী যে কেহ দুনিয়াতে লইয়া আসিয়াছেন দুনিয়াবাসী তাঁহার সঙ্গে শত্রুতা না করিয়া ছাড়ে নাই। যদি আমি সেই দিন পাই (অর্থাৎ জীবিত থাকি) তবে আমি প্রাণপণে যথাসাধ্য আপনার সাহায্য করিব।*

অতঃপর অল্পদিনের মধ্যেই অরাকা এন্তেকাল করিলেন। হেরা পর্বত-গুহার এই ঘটনার পর কিছুদিনের জন্য অহী বন্ধ থাকিল।×

অহী বন্ধ থাকাকালীন অবস্থা বর্ণনা পূর্বক জাবের (রাঃ) বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ (দঃ) ফরমাইয়াছেন (অহী বন্ধ থাকাবস্থায় যখন আমি অতি ব্যস্ত ও অস্থির ছিলাম✿ তখনকার ঘটনা)—একদা আমি পথ চলিবার কালে হঠাৎ উর্দ্ধ দিকের একটি আওয়াজ শুনিতে পাইলাম। তখন উর্দ্ধে তাকাইয়া দেখি, সেই ফেরেশতা (জিব্রিল) যিনি হেরা-পর্বতের গুহায় আমার কাছে আসিয়াছিলেন তিনিই আসমান জমিন পৃথিবীর মাঝখানে (অতিশয় জমকালো সোনার কুরসীতে আকাশ জুড়িয়া বসিয়া আছেন। তাঁহাকে এত বড় বিরাট

---

* এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, রসুলুল্লাহ (দঃ) নিজে কাহারও নিকট যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন নাই বা যাইতে উদ্যতও হন নাই। বিবি খাদিজাই তাঁহাকে অরাকার নিকট লইয়া গিয়াছেন। ইহা মাতৃজাতির স্বভাব সুলভ কোমলতা যে, তাঁহার প্রিয়জনের কোনরূপ অস্থিরতা দেখিলে প্রাচীন পারদর্শী জ্ঞানীদের কাছে যাতায়াত করিয়া অতি শীঘ্র প্রিয়জনের অস্থিরতা দূর করিতে চেষ্টা করেন। নতুবা প্রকৃতপক্ষে রসুলুল্লাহ (দঃ) আদৌ কোনরূপ অস্থির ছিলেন না, বরং সব ব্যাপারেই তিনি ভালরূপে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। নবুওতের পদ-মর্য্যাদা, ফেরেশতার পরিচয়, অহীর হকিকত সব কিছুই তিনি উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। অবশ্য নূতন নূতন—প্রাথমিক অবস্থা বলিয়া স্বাভাবিক ভাবে শারীরিক কিছু কষ্ট এবং গুরু দায়িত্বের বোঝার চাপের দরুণ মনেও নানা কথার উদয় হইতেছিল এবং প্রাণপ্রিয়া খাদিজার কাছে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন। খাদিজার বুদ্ধিমত্তা এবং হামদারদীর উপর তাঁহার পূর্ণ আস্থা ছিল। খাদিজার মনে কষ্ট হয় এই ভয়ে রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার সঙ্গে অরাকার নিকট যাইতেও কোন ওজর আপত্তি করেন নাই। অরাকাও কোন খারাপ কথা বলেন নাই বা খারাপ লোক ছিলেন না। বরং অরাকা রসুলুল্লার উম্মতের মধ্যে শামিল কি না এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও তিনি যে 'মোমেন' ছিলেন এ বিষয়ে আদৌ কোন সন্দেহ নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিয়াছেন, আমি স্বপ্নে অরাকাকে বেহেশতের নহরকূলে সাদা রেশমী পোষাক পরিহিত অবস্থায় দেখিয়াছি; নবীর স্বপ্ন অহী।

× এক রেওয়ায়েত আছে—অহী প্রায় তিন বৎসর পর্য্যন্ত বন্ধ ছিল এবং অন্য একজন ফেরেশতাকে হযরতের তত্ত্বাবধানের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখা হইয়াছিল। হযরত জিব্রিল (আঃ)ও মাঝে মাঝে আসিয়া সাক্ষাৎ করিতেন, কিন্তু যেহেতু প্রথমবারের অহীর ভারে হযরতের অনেক কষ্ট হইয়াছিল তাই তিন বৎসর যাবৎ আর অহী আনেন নাই। বরং অহী বন্ধ হওয়ার কারণে মনোবেদনা ও বান্ধবের মিলনের বিচ্ছেদ-যাতনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। সাময়িক ভাবে অহী বন্ধ করিয়া এইরূপ আগ্রহ ও মিলনাকাঙ্খা বর্দ্ধিত করাই আল্লার হেকমত ছিল। সাধারণতঃ বলা হয় অহী ছয় মাস কাল বন্ধ ছিল। (✿ অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আকারে দেখিলাম যে,) তাঁহাকে দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম* এবং ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বাড়ী চলিয়া আসিলাম। বাড়ীতে আসিয়া এইবারও বলিলাম—دثروني دثروني "আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও, আমাকে কম্বল গায়ে দিয়া দাও। এই দিন এই পাঁচটি আয়াত বা পূর্ণ ছুরা নাযেল হয়—

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ - قُمْ فَأَنْذِرْ - وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ - وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ - وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ - +

❊ অহী প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাণাধিক প্রিয় বান্ধবের সহিত মিলন-সূত্র। বান্ধবের মিলনের যে কি স্বাদ তাহা একমাত্র প্রেমিকজন ব্যতীত অন্য কেহই উপলব্ধি করিতে পারে না। যাঁহারা আল্লার প্রেমিক হইয়া খাঁটী পীরের কাছে তালকীন লইয়া আল্লার জেকের মোজাহাদা করতঃ আল্লার প্রেমকে সত্যিকার ভাবে খাঁটী ও স্থায়ী করিয়া লইয়াছেন তাঁহারা আল্লার প্রেমের মিলনের স্বাদের কিঞ্চিৎ নজীর বা নমুনা অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারেন না। এত বড় স্বাদের জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইলে প্রেমিকের মন কত উতলা এবং কত উৎকণ্ঠিতই না হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) অহী বন্ধ থাকাকালে এইরূপ বিচ্ছেদ যাতনাই ভোগ করিতেছিলেন এবং বিচ্ছেদ যাতনা সময় সময় এত চরমে পৌঁছিয়া যাইত যে, তিনি হেরা পর্বতের চূড়ার উপর আরোহণ করিয়া তথা হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিতে পর্য্যন্ত উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু পরম প্রেমিক তাঁর দৃষ্টিতে প্রেমাগ্নিও বাড়াইতেন। সঙ্গে সঙ্গে উর্দ্ধ জগতের বাণী আসিত। يا محمد । انك لرسول الله । হে মোহাম্মদ। কি করেন আপনি? আপনি যে আল্লার রসুল—প্রেরিত দূত। সাধারণ দূত নহেন, আল্লার প্রতিনিধি দূত; আপনাকে যে সেই প্রতিনিধিত্বের সমস্ত গুরুদায়িত্ব বহন করিতেই হইবে।

* শৈশবাবস্থায় উস্তাদকে, পীরকে বা অন্য কোন মুরুব্বিকে দেখিয়া ছেলেরা ভয় পায়। কিন্তু সে ভয় কোনরূপ ক্ষতি বা বিপদের আশঙ্কায় হয় না, স্বয়ং বড়দের আদব যাদের অন্তরে আছে তাদের উপর প্রাথমিক অবস্থায় এক প্রকার শ্রদ্ধা ও ভয় মিশ্রিত শক্তিমত্তার প্রভাব পতিত হয়, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এই ভয়ও সেই শ্রেণীর ভয় ছিল, অন্য কিছুই নহে।

+ ইহা ২৯ পারা ছুরা মোদ্দাচ্ছেরের প্রথম পাঁচটি আয়াত। অর্থ:—হে কমলীওয়ালা! (কম্বল গায়ে দিয়া ঘুমাইয়া থাকার সময় নাই।) আপনি উঠুন, লোকদিগকে (তাদের 'রব' প্রভু সম্বন্ধে, প্রভুর অর্পিত দায়িত্ব সম্বন্ধে এবং আখেরাতে যে প্রভুর দরবারে উপস্থিত হইয়া এই সব দায়িত্বের হিসাব বুঝাইয়া দিতে হইবে সে সম্বন্ধে) সতর্ক করিয়া দিন। (মানব সমাজের কল্যাণ সাধন এবং তাহাদের প্রকৃত কল্যাণের জন্য তাহাদিগকে স্বীয় দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা এবং তাহাদেরই হিতের জন্য তাহাদের কাছে ইসলামের সত্য বাণী প্রচার করাই ইসলাম ধর্মের প্রথম আদেশ।) এবং আপনি (নামায কায়েম করিয়া—প্রভুকে সেজদা করিয়া প্রভুর নিকট মাথা নত করতঃ) প্রভুর মহিমা প্রচার করুন। কাপড় জামা, দেহ ও আত্মা পবিত্র করুন। (এক আল্লার হইয়া যান;) যাবতীয় অপবিত্রতা—বিশেষতঃ মূর্তি পূজা গায়রুল্লার পূজা এবং এক আল্লার প্রেম আল্লার ভক্তি ব্যতিরেকে আল্লাহ-বিরোধী যত কামনা বাসনা প্রেম ভক্তি অর্চনা আরাধনা আছে সব চিরতরে বর্জন ও ত্যাগ করিয়া থাকুন—এ পর্য্যন্ত যেরূপ পাক-পবিত্র রহিয়াছেন চিরকালই তদ্রূপ থাকিবেন।

তারপর আর অহী বন্ধ হয় নাই, অনবরত পর পর অহী আসিতে লাগিল।

৪। হাদীছ ঃ—ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—প্রথম প্রথম যখন অহী নাযেল হইত তখন রসুলুল্লাহ (দঃ) অনেক কষ্ট করিতেন। এমনকি, জিব্রিল ফেরেশতা যখন অহী পড়িয়া শুনাইতেন, তখন হযরত (দঃ) সঙ্গে সঙ্গেই জিহ্বা এবং ঠোঁট নাড়িয়া পড়া আরম্ভ করিতেন; × (যাহাতে অহীর একটি অক্ষরও ছুটিয়া না যায় বা বেশী কম না হইতে পারে। ইহাতে রসুলুল্লাহর (দঃ) অনেক কষ্ট হইত।) যাহা লাঘব করার জন্য কোরআনের এই চারিটি আয়াত নাযেল হয়।

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۔ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۔ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ

فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۔ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۔

অর্থৎ—(হে প্রিয় রসুল!) আপনি অহীকে তাড়াতাড়ি মুখস্থ করিবার জন্য (এত কষ্ট করিবেন না—) সঙ্গে সঙ্গে জিহ্বা ও ঠোঁট নাড়িবেন না, জিব্রিল যখন পড়েন আপনি মন দিয়া কান লাগাইয়া শুনিবেন। সম্পূর্ণ মুখস্থ ও কণ্ঠস্থ করাইয়া দেওয়ার এবং পুনরায় আপনার মুখে অবিকলরূপে পড়াইয়া দেওয়ার ভার আমার উপর ন্যস্ত, ইহার জিম্মাদার আমি। অতএব, আমি যখন (জিব্রিলের মুখে আমার অহী) পড়িব তখন আপনি শুধু মনোযোগের সহিত অনুধাবন ও শ্রবণ করিবেন। পুনরায় বলিতেছি, ঐ অহী পূর্ণরূপে আপনার মুখে পুনরাবৃত্তি করান ও নির্ভুলরূপে পড়াইয়া দেওয়া আমার জিম্মায় রহিয়াছে। (ছুরা কেয়ামাহ্)

এই আয়াত নাযেল হওয়ার পর রসুলুল্লাহ (দঃ) সঙ্গে সঙ্গে পড়া বন্ধ করিয়া দিলেন। শুধু জিব্রিল যখন যাহা পড়িতেন খুব মনোযোগ দিয়া পূর্ণ একাগ্রতা সহকারে তাহা কান লাগাইয়া শুনিতেন। তাহাতেই সব কিছু তাঁহার মুখস্থ হইয়া যাইত এবং জিব্রিল চলিয়া যাওয়ার পর অবিকলরূপে তিনি উহা পড়িতে পারিতেন, একটি অক্ষরও এদিক ওদিক হইত না।

৫। হাদিছ ঃ—ইবনে আব্বাস রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, মানব জগতে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম অপেক্ষা বড় দাতা আর হয় নাই হইবেও না; তিনিই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ দানশীল। বিশেষ করিয়া যখন রমজান শরীফ আসিত—যখন জিব্রিল (আঃ) তাঁহার সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ করিতেন, তখন তাঁহার দানশীলতার সীমা পরিসীমা থাকিত না। জিব্রিল (আঃ) পবিত্র রমজান মাসে প্রত্যহ আসিয়া রসুলুল্লাহ (দঃ)কে কোরআন দওর করাইতেন।†

ইবনে আব্বাস (রাঃ) শপথ করিয়া বলিয়াছেন, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের (ফয়েজ, বরকত ও আধ্যাত্মিক) দান-দৃষ্টি জীবনীশক্তিদাতা বসন্তের মলয় বায়ু অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী ও ক্রিয়াশীল ছিল।

× ইহা বড়ই কঠিন কাজ। কারণ ইহাতে জিব্বা, ঠোঁট, কান ও মন চারটি অঙ্গকে একই সঙ্গে কর্মব্যস্ত রাখিতে হয়। († অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

ব্যাখ্যা :—এই হাদীছে হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ)কে সমস্ত মানব জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা সর্বশ্রেষ্ঠ ছখী বলা হইয়াছে। বাস্তবিকই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ও দানশীল ছিলেন। হাদিছ শরীফে উল্লেখ আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) কখনও কোন সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি "না" শব্দ ব্যবহার করেন নাই। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর মর্যাদা অনেক উর্দ্ধে; ছুনিয়ার ধন-দৌলত তাঁহার মর্যাদার তুলনায় অতি নগণ্য ও তুচ্ছ বস্তু। এই সব বস্তু দান করা ত তাঁহার নিকট খুবই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু এই হাদীছে যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ ছখী ও দাতা বলা হইয়াছে তাহার অর্থ শুধু এতটুকুই নহে, বরং আরও ব্যাপক। অর্থাৎ যে দানের দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি পশুত্বের স্বভাব বিশিষ্ট মানুষের জড়পিণ্ড ও মাটির আধ্যাত্মিক উন্নতির কারনে ফেরেশতারও উর্দ্ধে উঠিয়া যায় সেই আধ্যাত্মিক ফয়েজ দানেও তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর ফয়েজ কত শক্তিশালী কত ব্যাপক ছিল তাহা কিঞ্চিৎমাত্র উপলব্ধি করিবার জন্য বসন্তের মলয় বায়ুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ছুনিয়ার বুকে বসন্তের বায়ুর দ্বারা কি ব্যাপক পরিবর্তনই না আছে। হিম-ঋতুর প্রকোপে গাছের পাতা ঝরিয়া গাছগুলি জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় থাকে, তরু-লতা অগ্নিদগ্ধের ন্যায় বিবর্ণ ও শ্রীহীন হইয়া যায়, সমস্ত পশু-পক্ষী এমনকি মানুষের মনের পুলক পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু যখনই ঋতুরাজ মধুকাল বসন্তের হাওয়া জীবনীশক্তি সঞ্চার করিতে থাকে—তখনই পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু, বৃক্ষ-লতা, গাছপালা সকলেই নূতন জীবন ধারণ করিয়া উঠে। বসন্তের জীবনী শক্তিবাহী মলয় বায়ুর বদৌলতে গাছপালার শুক্ক ডালগুলি নূতন পাতায় ফলে-ফুলে সুশোভিত হয়, অগ্নিদগ্ধ মাটি সবুজ ঘাসে ছাইয়া যায়, সকলের প্রাণেই উল্লাসের ঢেউ খেলিতে থাকে। তেমনই ভাবে যুগ যুগান্তব্যাপী মৃতবৎ আত্মসমূহ এবং মেঘাচ্ছন্ন অন্তকরণগুলি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আবির্ভাবে তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহার ছোহবতের ও শিক্ষার ফয়েজ ও বরকতের কল্যাণে শুধু সজীব, জীবন্ত ও আলোকিতই নহে—বরং এমন সঞ্জীবনী শক্তিসম্পন্ন, জীবনদাতা ও আলোদাতা হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা

---

† দওর করানোর অর্থ—পরস্পর একে অন্যকে পাঠ করিয়া শুনানো। যেমন বর্তমানেও হাফেজদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত আছে যে, একজন হাফেজ সাহেব প্রথমে পড়েন, অন্য হাফেজ সাহেব শুনিতে থাকেন—যাহাতে একটি জের জবরেরও ভুল না হয়; তারপর দ্বিতীয় হাফেজ সাহেব পড়েন, প্রথম হাফেজ সাহেব শুনেন। এইরূপে পুরা কোরআন শরীফ একে অন্যকে শুনাইয়া থাকেন এবং পুরা কোরআন শরীফের হেফজ কায়েম রাখেন। এইরূপেই জিব্রিল (আঃ) পড়িয়া শুনাইতেন হযরতকে, আবার হযরত পড়িয়া শুনাইতেন জিব্রিলকে। প্রত্যেক রমজানেই এইরূপ করিতেন—এমনকি যে বৎসর রসুলুল্লাহ (দঃ) এন্তেকাল করেন সেই বৎসর সম্পূর্ণ কোরআন শরীফ দুইবার দওর করিয়াছিলেন।

আলোচ্য হাদীছের এই অংশই অত্র পরিচ্ছেদে লক্ষণীয় যে, অহী সংরক্ষণে কিরূপ বাহ্যিক সুব্যবস্থাও আল্লাহ তায়ালা রাখিয়াছিলেন। পবিত্র কোরআন অহীরই প্রধান বস্তু।

সমস্ত জগতকে নূতন জীবনের ও নূতন আলোকের সন্ধান দিতে পারিয়াছিলেন। এই তথ্যটি কোন এক কবি কি সুন্দরভাবে বুঝাইয়াছেন।

در فشانی نے تری قطروں کو دریا کر دیا
دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا
خود نہ تھے جو راہ پر غیروں کے ہادی بن گئے
کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

অর্থাৎ রসুলুল্লার ফয়েজ ও শিক্ষা সমূহ কি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন ছিল যে, তিনি বিন্দুকে সাগরে পরিণত করিয়াছিলেন। অর্থাৎ যাহারা জ্ঞানে ও গুণে নগণ্য বিন্দুবৎ ছিল তাহাদিগকে তিনি সাগর সমতুল্যরূপে গড়িয়াছিলেন। অন্ধকারাচ্ছন্ন অন্তরকে আলোকপূর্ণ ও অন্ধ চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা মৃত ছিল তাহাদিগকে তিনি শুধু জীবিতই নহে—জীবনদাতারূপে গঠন করিয়াছিলেন। যাহারা নিজেরাই পথ পথভ্রষ্ট—তাহাদিগকে তিনি গঠন করিয়াছিলেন সারা জগতের পথ প্রদর্শক ও পরিচালকরূপে।

আলোচ্য হাদিছে রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই বৈশিষ্ট্যের দিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে। জগতের প্রত্যেক সৃষ্টিজীব ও সৃষ্টবস্তু যেরূপ বসন্তের সুশীতল মলয় বায়ুর দ্বারা জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আধ্যাত্মিক ফয়েজের সামান্য ছিটা ফোটার দ্বারা তার চাইতে অধিক জীবনীশক্তি জগদ্বাসী লাভ করিয়াছে ও কেয়ামত পর্যন্ত তাহা লাভ করিতে থাকিবে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যখন এই দুনিয়াতে ছিলেন তখন তাঁহার ছোহবত ও সাহচর্য্য দ্বারা এবং মজলিসের দ্বারা এই ফয়েজ বিতরিত হইত। উপযুক্ত ক্ষেত্র ও পাত্রসমূহ তদ্দ্বারা ফজিলত ও ফুলিত হইত। হানযালা (রাঃ) নামক এক ছাহাবী একদিন হযরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া এই অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাষ বর্ণনা করিয়াছেন। হানযালা (রাঃ) হযরতের নিকট আরজ করিলেন, ইয়া রসুলুল্লাহ! আপনার ছোহবতে ও সাহচর্য্যে যখন আমরা থাকি তখন আমাদের মনের এমন অবস্থা হয় যে আমরা আল্লাকে, আখেরাতকে এবং বেহেশত-দোজখকে যেন চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু যখন আপনার দরবার হইতে উঠিয়া স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে যাইয়া মিশি তখন আর দেলের ঐরূপ অবস্থা থাকে না; ঈমানের আভা যেন কম হইয়া যায়। এরূপ পরিবর্তনের জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। হযরত বলিলেন—আমার মজলিসে তোমাদের দেলের যে অবস্থা হয় ঐ অবস্থা সব সময় থাকিলে তোমরা এত উর্দ্ধে উঠিয়া যাইতে যে, ফেরেশতাগণ রাস্তাঘাটে এবং তোমাদের শয়ন-শয্যায় তোমাদের সঙ্গে মোছাফাহা করিতেন।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের এন্তেকালের পর এই নেয়ামত হইতে দুনিয়া মাহরূম হইয়া গিয়াছে। কারণ, এই মোবারক দরবার ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং এই

সেই মোবারক নজরও উঠিয়া গিয়াছে। আনাস (রাঃ) এই দিকেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমরা হযরত রসুলুল্লার (দঃ) দাফন কার্য্য সমাধা করিতে না করিতেই আমাদের অন্তরের অবস্থার পরিবর্তন অনুভূত হইয়াছে। ছাহাবী আনাসের উক্তির অর্থ এই নয় যে, ছাহাবীগণের ঈমান পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। না, না, ঈমানের জ্যোতি ও আভার উপর কিঞ্চিৎ মলিনতা আসিয়া গিয়াছে এই কথাটিই মাওলানা রুমী এইভাবে বুঝাইয়াছেন :—

گر زباغ دل خلالے کم بود — بر دل سالك هزاراں غم بود

অর্থাৎ আল্লার আশেক যাঁহারা তাঁহাদের অন্তর-উদ্যান হইতে একটি মাত্র তৃণ কমিয়া গেলেই তাঁহারা অত্যধিক বিচলিত হইয়া পড়েন যে, হায়! আমাদের ঈমান বুঝি নষ্ট হইয়া গিয়াছে প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান নষ্ট হয় না। ঈমানের আভা ও জ্যোতি কিছু কমিয়া যায় মাত্র।

হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের সেই ফয়েজ তাঁহার পর তাঁহার প্রদত্ত কোরআন হাদীছের এলেমের ও আলেমের মাধ্যমে কিছুটা রহিয়া গিয়াছে। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই কথা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

اَللّٰهُ اَجْوَدُ جُوْدًا وَاَنَا اَجْوَدُ بَنِیْ اٰدَمَ وَاَجْوَدُهُمْ بَعْدِیْ رَجُلٌ عَلَّمَ عِلْمًا فَنَشَرَهٗ -

অর্থাৎ আল্লার চেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আর কেহ নাই। তারপর মানব জাতির মধ্যে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা আমি। আমার পরে সবচেয়ে বড় ছখী ও বড় দাতা সেই আলেম ব্যক্তি যিনি এলেম হাসিল করিয়াছেন এবং দুনিয়ায় মত্ত না হইয়া সেই এলেম প্রচার ও প্রসারেই জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। এই বিষয়টিই মাওলানা রুমী এইরূপে বুঝাইয়াছেন :—

چونکه خورشید رفت وما را کرد داغ - چاره نبود درمقامش از چراغ
چونکه گل رفت و گلستاں شد خراب - چاره نبود درمقامش از گلاب

অর্থাৎ সূর্য্য যখন আমাদিগকে অন্ধকারে ফেলিয়া অস্তমিত হইয়া যায় তখন চেরাগ জ্বালাইয়া কিঞ্চিৎ আলো হাসিল করা ব্যতিরেকে আমাদের আর গত্যান্তর থাকে না। গোলাপ ফুল যখন দুনিয়াতে পাওয়া যায় না এবং গোলাপ ফুলের উদ্যান বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন গোলাপী আতর ও গোলাপের পানি হইতে সুগন্ধি লাভ করা ব্যতিরেকে গোলাপ ফুলের সুগন্ধি হাসিল করার অন্য কোন উপায় থাকে না। এইরূপ নবী (দঃ) যখন দুনিয়াতে নাই, নবীর মজলিস নাই, নবীর দৃষ্টি নাই, তখন নবীর খাঁটি নায়েবদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাঁহাদের মজলিসে নবীর বাণী শ্রবণ করা ব্যতিরেকে মানব মুক্তির অন্য কোনও পথ নাই।

৬। হাদীছ ঃ—* আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন—আবু সুফিয়ান আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন, † ছোলেহ্-হোদায়বিয়ার+ পর তিনি বাণিজ্য করিতে সিরিয়া দেশে গিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে মক্কার কাফের কোরায়েশ দলের আরও অনেক সওদাগর ছিল। তিনি বলেন, এই সময় হঠাৎ একদিন রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান। হেরাক্লিয়াস তখন ইলিয়া শহর (বায়তুল-মোকাদ্দাসে) আসিয়াছিলেন।‡ সেখানে তিনি দরবার সাজান এবং দরবারে তাঁহার পরিষদবর্গের সম্মুখে একসঙ্গে আমাদিগকে ডাকিয়া পাঠান; দোভাষীর মারফৎ কথাবার্তা হয়। হেরাক্লিয়াস দোভাষী মারফৎ আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন, আরব দেশে যে লোকটি নবুয়তের দাবী করিতেছেন তাঁহার ঘনিষ্ঠ কোন আত্মীয় আপনাদের মধ্যে কেহ আছেন কি? যদি থাকেন, তিনি কে? আবু সুফিয়ান বলেন—আমি বলিলাম, হাঁ আছে, আমিই তাঁহার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হেরাক্লিয়াস তখন আমার সম্বন্ধে বলিলেন, এই লোকটিকে আমার নিকটে বসাও এবং তাহার অন্যান্য সাথীদিগকে তাহার নিকটবর্তী পিছনে বসাও। তারপর হেরাক্লিয়াস দোভাষীকে বলিলেন, তুমি তাহাদিগকে (আবু সুফিয়ানের সঙ্গীদিগকে) বল, আমি ইহার নিকট (আবু সুফিয়ানের নিকট) নবুয়তের দাবীদার লোকটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিব। যদি ইনি কোন কথা মিথ্যা বলেন, তবে আপনারা তাহার

---

* এই হাদীছখানার তরজমা মদীনা শরীফে রসুল ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের মসজিদের বিশিষ্ট স্থানে—রওজা সংলগ্ন "রওজাতুম মিন্ রিয়াজিল জান্নাহ"তে বসিয়া লেখা হইয়াছে।

† আলোচ্য ঘটনাটি যখন সংঘটিত হইয়াছিল তখন আবু সুফিয়ান কাফের ছিলেন কিন্তু রসুলুল্লাহ (দঃ) কর্তৃক মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। মোসলমান অবস্থায় তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট ঐ ঘটনাটি বর্ণনা করেন।

+ ষষ্ঠ হিজরীতে রসুলুল্লাহ (দঃ) প্রায় পনর শত ছাহাবা সঙ্গে লইয়া "ওমরা" করার উদ্দেশ্যে মক্কার দিকে রওয়ানা হন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর মক্কার নিকটবর্তী "হোদায়বিয়া" নামক স্থানে কোরায়েশগণ কর্তৃক তিনি মক্কায় প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হন। উভয় পক্ষ হইতে যুদ্ধের হুঙ্কার শুনা যাইতে লাগিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষ একটি মীমাংসায় উপনীত হইয়া দশ বৎসরের মেয়াদে একটি সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করেন। এই সন্ধি চুক্তিই ইতিহাসে "ছোলেহ্-হোদায়বিয়া" নামে পরিচিত। ইহার বিবরণ ইনশা-আল্লাহ তৃতীয় খণ্ডে রসুলুল্লার জেহাদ সমূহের ঐতিহাসিক বিবরণে বর্ণিত হইবে। ছোলেহ-হোদায়বিয়ার দ্বারা শান্তি হইয়া কোরায়েশদের জন্য সিরিয়ার বাণিজ্য পথে মোসলমানদের দ্বারা সৃষ্ট অবরোধ দূর হইল এবং তাহারা অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরারম্ভ করিল।

‡ রোম ও পারস্যের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছিল. রোম সম্রাট খৃষ্টান হেরাক্লিয়াস মান্নত মানিয়া ছিলেন যে, যদি রোমানগণ এই যুদ্ধে জয়ী হয় তবে তিনি পদব্রজে পবিত্র ইলিয়া (বায়তুল মোকাদ্দাস) জেয়ারত করিবেন। যুদ্ধে রোমানগণ জয়ী হইলে সম্রাট হেরাক্লিয়াস বায়তুল মোকাদ্দসে উপস্থিত হন।

মিথ্যাটুকু আমাকে ধরাইয়া দিবেন। আবু সুফিয়ান (এখন মোসলমান অবস্থায়) বলিতেছেন যে, খোদার কসম—যদি তখন আমার সঙ্গীগণ কর্তৃক আমি মিথ্যাবাদীরূপে প্রচারিত হওয়ার লজ্জা আমাকে বাধা প্রদান না করিত তাহা হইলে আমি রোম সম্রাটের নিকট মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অবশ্যই মিথ্যা বলিতাম। (তাঁহার মিশনকে ব্যর্থ করার এই সুবর্ণ সুযোগ আমি কিছুতেই ছাড়িতাম না।)

হেরাক্লিয়াস ও আবু সুফিয়ানের প্রশ্নোত্তর :

হেরাক্লিয়াস—এই লোকটির জন্ম কিরূপ বংশে ?

আবু সুফিয়ান—তাঁহার জন্ম অতি উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বংশে।

হেরাক্লিয়াস—এইরূপ কথা অর্থাৎ নবুয়তের দাবী আপনাদের বংশে তাঁহার পুর্বে অন্য কেহ করিয়াছেন কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার দলভুক্ত হয় বেশী, না—গরীব জনসাধারণ ?

আবু সুফিয়ান—গরীব জনসাধারন।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার দলের লোক সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িতেছে, না—কমিতেছে ?

আবু সুফিয়ান—কমিতেছে না, বরং ক্রমান্বয়ে সংখ্যা বাড়িতেছে।

হেরাক্লিয়াস—কেহ তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোনও দোষ-ত্রুটি দেখিয়া সে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া উহা পরিত্যাগ করে কি ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—নবুয়তের দাবী করিবার পুর্বে কখনও কি এই লোকটির কোন মিথ্যাবাদিতা আপনাদের নিকট ধরা পড়িয়াছে ?

আবু সুফিয়ান—না।

হেরাক্লিয়াস—এই লোক কি কখনও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন ?

আবু সুফিয়ান—না।

কিন্তু আমরা সম্প্রতি একটি সন্ধিচুক্তি করিয়াছি ; জানি না ঐ ব্যাপারে তিনি কি করেন।× (আবু সুফিয়ান বলেন,) এই কথাটুকু ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার মত সুযোগ আমি আর পাই নাই।

হেরাক্লিয়াস—তাঁহার (দলের) সঙ্গে আপনাদের কোনও যুদ্ধ হইয়াছে কি ? এবং হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছে ?

× আবু সুফিয়ানা এখানে চুক্তিভঙ্গের যে আশঙ্কা প্রকাশ করিলেন তাহা প্রকৃত পক্ষে রসুলুল্লার কোনও ত্রুটির দরুণ নহে বরং কোরায়েশগণই সন্ধির শর্তের বরখেলাফ রসুলুল্লাহ পক্ষীয় এক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিজ পক্ষীয় দলকে গোপনে সমর-সাহায্য করিয়া চুক্তিভঙ্গের সুচনা করে। আবু সুফিয়ান নিজেদের সেই বিশ্বাসঘাতকতার বিষময় ফলের ভয়ে শঙ্কিত ছিলেন।

আবু সুফিয়ান—হাঁ যুদ্ধ হইয়াছে। যুদ্ধে কখনও তিনি জয়ী হন, আমরা পরাজিত হই (যেমন বদরের যুদ্ধ)। কখনও আমরা জয়ী হই, তিনি পরাজিত হন (যেমন ওহোদের যুদ্ধ)।

হেরাক্লিয়াস—তিনি আপনাদিগকে কি কি আদেশ করিয়া থাকেন?

আবু সুফিয়ান—তিনি আমাদিগকে এই কাজসমূহের আদেশ করিয়া থাকেন—

اُعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَآؤُكُمْ وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلٰوةِ وَالزَّكٰوةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَبِوَفَاءِ الْعَهْدِ وَاَدَاءِ الْاَمَانَةِ وَالصِّلَةِ ০

১। এক আল্লার বন্দেগী কর, অন্য কাহারও পূজা করিও না, কাহাকেও আল্লার সহিত শরীক করিও না (—মানুষ-পূজা, মূর্ত্তি-পূজা, দেব-দেবীর পূজা, পীর-পয়গাম্বর পূজা ইত্যাদি করিও না) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদের যাবতীয় কুসংস্কার ত্যাগ কর।

২। নামায কায়েম কর। (ঐ তৌহিদকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত করিতে কাহাকেও সেজদা না করিয়া এক আল্লাহকে সেজদা করতঃ নামায পড়।)

৩। যাকাৎ * দান (করিয়া গরীবের উপকার) কর। (গরীবের প্রতি দয়ালু হও)।

৪। সত্যবাদী হও (মিথ্যা বলিও না, প্রতিজ্ঞা রক্ষায় বিশ্বস্ত প্রমাণিত হও)।

৫। সংযমী হও। (চরিত্রের সততা ও সতীত্ব রক্ষা করিয়া পবিত্র জীবন-যাপন কামরিপু ও লোভরিপু দমন করিয়া যাবতীয় দুর্নীতি ও দুশ্চরিত্রতা বর্জন করিয়া চল)।

৬। আমানতের পূর্ণ হেফাজত করিয়া প্রত্যেকের হক নিজ দায়িত্ব জ্ঞানে তাহাকে পৌঁছাইয়া দাও (আমানাতে খেয়ানত বা দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করিও না)।

৭। মানুষের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া বিচ্ছেদ ও ভাঙ্গন সৃষ্টিকারী হইও না, বরং প্রত্যেকের সাথে মধুর ব্যবহার দ্বারা মিল মহব্বত কায়েম রাখ। বিশেষতঃ মাতা-পিতা, ভাই-বোন, চাচা-ভাতিজা, মামু-ভাগ্নে, ফুফু-খালা এবং আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, যাহাদের সহিত সকল সময় মেলামেশা ও উঠাবসা হইয়া থাকে তাহাদের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া তাহাদের মনে ব্যথা দিও না; সর্বাবস্থায় তাহাদেব সহিত ভাল ব্যবহার দ্বারা পরস্পর মিল-মহব্বত কায়েম রাখিয়া চল।*

---

* الزكوة বোখারী শরীফ ১৮৭ পৃষ্ঠায় وفاء العهد ফতহুলবারীতে এবং اداء الامانة মোসলেম শরীফে উল্লেখ আছে।

* আরবী ভাষায় الصلة শব্দটি এতই ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে, এত দীর্ঘ অনুবাদ করিয়াও আমার মনে হইতেছে না যে, শব্দটির পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিতে পারিয়াছি।

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

আবু সুফিয়ান বলেন—এই দশটি প্রশ্ন ও উত্তরের পর হেরাক্লিয়াস প্রতিটি উত্তরের উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। দোভাষীকে বলিলেন—তুমি বুঝাইয়া দাও যে, আমি প্রথম প্রশ্ন তাঁহার (রসুলুল্লাহ) বংশ সম্বন্ধে করিয়াছি। আপনি বলিয়াছেন, তাঁহার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে আল্লার রসুলগণ উচ্চ বংশেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছি যে, ইতিপূর্বে আপনাদের মধ্যে এই দাবী কেহ করিয়াছে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি এরূপ কথা ইতিপূর্বে কেহ বলিয়া থাকিত, তবে আমি মনে করিতাম যে, লোকটি অন্যের অনুকরণ করিতেছে; অন্যের দেখাদেখি একটা কথা বলিতেছে। তৃতীয় প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার বাপ-দাদা পূর্বপুরুষদের মধ্যে কেহ রাজা বাদশা ছিলেন কি না? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, যদি তাঁহার পূর্বপুরুষের মধ্যে কেহ রাজা-বাদশাহ থাকিতেন তবে সন্দেহ করা যাইত যে, হয়ত তিনি তাঁহার বাপ-দাদার সিংহাসন লাভ করিতে চাহেন। চতুর্থ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, উক্ত লোকটি এই কথা বলার পূর্বে অর্থাৎ নবুয়তের দাবী করার পূর্বে কখনও কোন কথায় তাঁহাকে আপনারা মিথ্যাবাদীরূপে পাইয়াছেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার ধারণা এই যে, যে লোক জীবন ভর মানুষের বেলায় মিথ্যা পরিহার করিয়া আসিয়াছেন তিনি যে হঠাৎ আল্লার সম্বন্ধে মিথ্যা বলিবেন ইহা অবান্তর। পঞ্চম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, প্রভাবশালী ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ তাঁহার অনুগামী হইতেছে বেশী, না—গরীব জনসাধারণ? আপনি বলিয়াছেন যে, গরীব জনসাধারণ। আমার মন্তব্য এই যে, সাধারণতঃ গরীব জনসাধারণই প্রথমে সত্য নবীগণের অনুগামী হইয়া থাকে। ষষ্ঠ প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, না—কমিতেছে? আপনি বলিয়াছেন, বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা মন্তব্য এই যে, বাস্তবিক পক্ষে সত্য ধর্ম এবং সত্য ঈমানের ইহাই লক্ষণ যে, ক্রমান্বয়ে উহা বৃদ্ধি পাইতে থাকে এবং এইভাবে উহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। সপ্তম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তাঁহার ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর কেহ সেই ধর্মের আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় অপছন্দ করিয়া ধর্ম পরিত্যাগ করে কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্যিকারের ঈমান ও সত্যিকারের ধর্ম যখন মানুষের অন্তঃস্থলে বদ্ধমূল হইয়া

আত্মীয়-স্বজনের সহিত ভাল ব্যবহার করা তাহাদের উপকার করা, বিপদে তাহাদের সাহায্য করা ইহা মানব চরিত্রের অতি উচ্চ স্তরের স্বভাব, ইহাকে স্বজন-তোষণ বলা যায় না। নিন্দনীয় স্বজন-তোষণ ও ঘৃণিত স্বজন-প্রীতির অর্থ এই যে, অন্যের হক নষ্ট করিয়া স্বীয় আত্মীয়ের মন রক্ষা করা। যেমন, রাষ্ট্রীয় আমানতের মাল বা পদ উপযুক্ত স্থানে ও যোগ্যতর ব্যক্তিকে না দিয়া নিজের অযোগ্য আত্মীয়কে দেওয়া। নিজের মাল আত্মীয়কে দেওয়া দূষণীয় নহে এবং আত্মীয়তার মাপকাঠিতে নয়, বরং যোগ্যতার মাপকাঠিতে মাপিয়া যদি কোন যোগ্যতম আত্মীয়কে রাষ্ট্রীয় পদ বা মাল দেওয়া তাহা হইলেও দূষনীও হইবে না।

যায়, তখন সে উহার এত আস্বাদ লাভ করে যে, সে আর তাহা কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারে না। অষ্টম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, এই লোকটি বিশ্বাসঘাতকতা বা চুক্তিভঙ্গ করেন কি? আপনি বলিয়াছেন—না। আমার মন্তব্য এই যে, বাস্তবিকই সত্য নবীগণ কখনও বিশ্বাসঘাতকতা বা অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন না। নবম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, আপনাদের সঙ্গে তাঁহার কোন যুদ্ধ হইয়াছে কি না, হইয়া থাকিলে যুদ্ধের ফলাফল কি? আপনি বলিয়াছেন—যুদ্ধ হইয়াছে এবং যুদ্ধে কখনও তিনি জয়লাভ করিয়াছেন, আবার কখনও পরাজিতও হইয়াছেন। আমার মন্তব্য এই যে, প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থিব ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রে সর্বদা জয়ী হওয়া পয়গাম্বরের কোন বিশেষত্ব নহে; বরং কষ্ট, সাধনা, তিতিক্ষা, পরাজয় ও পরীক্ষার ভিতর দিয়া পরিণামে জয়যুক্ত হওয়াই তাঁহাদের সাধরণ নিয়ম। দশম প্রশ্ন এই করিয়াছিলাম যে, তিনি কি কি আদেশ ও নিষেধ করিয়া থাকেন? আপনি বলিয়াছেন যে, তিনি এক আল্লার বন্দেগী করিতে আদেশ করেন, কাহাকেও আল্লার শরীক করিতে নিষেধ করেন—(মূর্তি বা দেব দেবীর পূজা বা মানুষ পূজা করিতে নিষেধ করেন।) আল্লার উদ্দেশ্যে নামাজ পড়িতে, সত্যবাদী হইতে এবং বিশ্বস্ত, সদাচারী ও সংযমী হইতে পরোপকারী, সদয় ও সদ্ব্যবহারকারী হইতে বলেন। আমার মন্তব্য এই যে, আপনি যাহা কিছু বলিয়াছেন বাস্তবিকই যদি সে সব সত্য হয়, তবে নিশ্চয় জানিবেন, এই ব্যক্তি অতি শীঘ্র আমার পায়ের তলার এই দেশ পর্য্যন্ত জয় ও অধিকার করিয়া লইবেন। এ সম্বন্ধে আমার পূর্ণ জ্ঞান ও সন্দেহাতীত বিশ্বাস ছিল যে, তিনি (অর্থাৎ আখেরী পয়গাম্বর—শেষ যামানার নবী) আসিবেন। কিন্তু আমার এই ধারণা ছিল না যে, তিনি আপনাদের আরববাসীদের মধ্য হইতে হইবেন।+ যদি আমি বুঝি যে, আমি তাহার নিকট পৌঁছিতে পারিব, তবে নিশ্চয়ই আমি তাঁহার খেদমতে হাজির হইয়া তাঁহার দর্শন লাভ করিব। আর যদি আমার ভাগ্যে তাঁহার দর্শন ও সাহচর্য লাভ জোটে তবে তাঁহার পদ ধৌত করিয়া জীবনকে সার্থক করিব।

এই পর্য্যন্ত প্রশ্নোত্তর ও মন্তব্য প্রকাশ করার পর হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের প্রেরিত পত্রখানা আনাইলেন এবং উহা পাঠ করা হইল। রসুলুল্লাহ (দঃ) পত্রখানা দেহইয়া কল্‌বী নামক ছাহাবীর হাতে বোছরার* শাসনকর্তার মারফৎ হেরাক্লিয়াসের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। পত্রখানার ভাষা ও মর্ম এই ছিল:

+ পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে আমাদের হজরত (দঃ) সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খারূপে সকল কথা বর্ণিত ছিল। কিন্তু পাদ্রিগণ আসল কিতাবের বর্ণনা ও শব্দাবলী পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছিল। হেরাক্লিয়াস আসল কিতাবের প্রকৃত বর্ণনা দেখেন নাই। পরিবর্তিত বর্ণনা দেখিয়াছিলেন—সেই জন্যই তিনি ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই যে, আখেরী পয়গাম্বর আরব দেশে পয়দা হইবেন।

* বর্তমান জর্দানের অন্তর্গত তৎকালীন একটি শহরের নাম বোছরা।

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ اِلٰى هِرَقْلَ عَظِيْمِ الرُّوْمِ - سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَدْعُوْكَ بِدِعَايَةِ الْاِسْلَامِ - اَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ - فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ عَلَيْكَ اِثْمَ الْيَرِيْسِيِّيْنَ وَيَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ لَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ - فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ -

"বিছমিল্লাহের রাহমানের রাহীম"

প্রেরক—আল্লার দাস, আল্লার নিয়োজিত ও প্রেরিত রসুল মোহাম্মদ।

প্রাপক—রোমান জাতির বিশিষ্ট ব্যক্তি হেরাক্লিয়াস।

সম্ভাষণ—শান্তি তাহাদের জন্য যাহারা সত্য পথের অনুসারী। অতঃপর—

আমি আপনাকে ইসলামের আকুল আহ্বান জানাইতেছি। আপনি ইসলাম গ্রহণ করুন (স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার আনুগত্য স্বীকার করুন)। তাহা হইলেই আপনি শান্তি (ও মুক্তি) লাভ করিতে পারিবেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে আল্লাহ আপনাকে দ্বিগুণ পুরস্কার (পরকালের মুক্তি এবং ইহকালের রাজত্বের সম্মান ও সুখ ভোগ) দান করিবেন।* যদি আপনি আমার এই আহ্বানে সাড়া না দেন, তবে (আপনার পাপ ত আপনার থাকিবেই, তদতিরিক্ত) আপনার প্রজাবর্গ ও অনুচরবর্গের পাপের বোঝাও আপনার উপর পড়িবে। (আল্লাহ তাঁহার স্বীয় পবিত্র বাণীর মধ্যে নবী ও নবীর উম্মতগণের পক্ষ হইতে ফরমাইয়াছেন) হে কেতাবধারী জ্ঞানীগণ! আসুন; (সংস্কার পরিহার করিয়া ও স্থির মস্তিষ্ক লইয়া আমরা চিন্তা করি—) আপনাদের ও আমাদের মধ্যে (পার্থক্য কতটুকু?) যতটুকু ঐক্যমত ততটুকুর মধ্যে আমরা সকলে এক হইয়া যাই। আপনারাও নাস্তিক নন আমরাও নাস্তিক নই। আপনারাও সাকারবাদী

---

* হেরাক্লিয়াস নাছরানী ছিলেন। ইহুদী বা নাছরানী ইসলাম গ্রহণ করিলে হাদীছ অনুযায়ী সে দ্বিগুণ ছওয়াবের অধিকারী হইয়া থাকে, এতদ্ভিন্ন তাঁহার অনুকরণ করিয়া অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করিবে, সে কারণেও তিনি অধিক ছওয়াবের অধিকারী হইবেন।

মূর্তিপূজক বা দেব-দেবীর পূজারী নন—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী এবং আমরাও সাকারবাদী নই, মূর্তিপূজক বা দেব দেবীর পূজারী নই—নিরাকারবাদী এক খোদাবাদী, একত্ববাদী। আসুন আমরা সকলে একত্র ও একতাবদ্ধ হইয়া এক নিরাকার খোদার বন্দেগী করি; এক খোদার সঙ্গে অন্য কাহাকেও শরীক না করি; এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহাকেও—কোন মানুষকে বা কোন সৃষ্ট পদার্থকে আমরা খোদা রূপে গ্রহণ না করি। (মুখের কথায় বা অন্যকে বুঝাইতে অনেকেই সততার পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু যাহার মধ্যে কার্য্যতঃ ও স্বার্থের বিপক্ষে সততা পাওয়া যায় সে-ই প্রকৃত মানুষ। এই জন্য আল্লাহ তায়ালা মোসলমানগণকে সতর্ক করিয়া দিতেছেন যে,) তোমাদের আন্তরিক আহ্বানেও যদি তাহারা সাড়া না দেয়, তবে খবরদার! তোমরা যেন স্রোতে ভাসিয়া না যাও। একতা লাভ করিতে গিয়া মূলমন্ত্র যেন ভুলিয়া না যাও। যদি তাহারা তোমাদের এই সরল সত্য ডাকে সাড়া না দেয় তবে তোমরা (আদৌ কোনরূপ ভয়, দুর্বলতা বা হীনমন্যতা—Inferiority complex নিজেদের মধ্যে আসিতে দিও না।) দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিয়া দাও যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমরা কিন্তু অটল অনড়—এক খোদারই উপাসক এক খোদারই আনুগত্য স্বীকারকারী।

আবু সুফিয়ান বলেন—হেরাক্লিয়াস যখন তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করিলেন এবং পত্র পড়া শেষ হইল, তখন লোকদের মধ্যে ভীষণ হট্টগোল ও হৈ হোল্লা পড়িয়া গেল। (আর কোন কথা হইতে পারিল না;) আমাদিগকে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। বাহিরে আসিয়া আমি আমার সঙ্গীদিগকে বলিলাম ওহে! আমার মনে হয় আবু কাবশার পুত্রের+ (মনোবাঞ্ছা যেন পুরা হইয়া যাইবে,) তাঁহার মিশন এত শক্তিশালী হইয়াছে যে, শ্বেতাঙ্গদের রাজা রোম সম্রাট পর্য্যন্ত তাঁহাকে ভয় করে। আবু সুফিয়ান বলেন—সেই দিন হইতেই আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে মোহাম্মদ (দঃ)-এর মিশন বিজয়ী ও সফলকাম হইবে—এমনকি মক্কাবিজয়ের সময়ে আল্লাহ তায়ালা আমাকে মুসলমান হওয়ার তৌফিক ও সামর্থ দান করিলেন।

ইবনে নাতুর* হেরাক্লিয়াসের পক্ষ হইতে সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্তা এবং প্রধান পাদ্রী ছিলেন, বিশেষতঃ তাঁহার সহিত হেরাক্লিয়াসের বন্ধুত্বও ছিল। তিনি বলিয়াছেন—

+ রসুলুল্লার আদি পুরুষদের মধ্যে কোন একজন অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম ছিল আবু কাবশাহ। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার দুধ-বাপের এই নাম ছিল। মক্কার কাফেরগণ রসুলুল্লার প্রতি শক্রতামূলক-ভাবে তাঁহাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এই অপরিচিত লোকটির সহিত সম্পৃক্ত করিয়া রসুলুল্লাহকে অভিহিত করিত। "মোহাম্মদ" শব্দের অর্থ প্রশংসিত তাছাড়া কোরায়েশ বংশের কোন খ্যাতনামা ব্যক্তির দ্বারা পরিচয় করাইলে রসুলুল্লার মর্য্যাদা বাড়িয়া যায় তাই তাহারা ঈর্ষা বশে রসুলুল্লাহকে ইবনে আবু কাবশাহ তথা আবু কাবশার বংশধর বা পুত্র বলিয়া অভিহিত করিত।

* ইবনে নাতুর একজন প্রসিদ্ধ পাদ্রী ছিলেন, পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।

হেরাক্লিয়াস যখন ইলিয়া (বায়তুল-মোকাদ্দাস) আসিয়াছিলেন, তখন একদিন সকাল বেলায় তাঁহাকে খুবই বিষন্নচিত্ত ও চিন্তাযুক্ত দেখাইতেছিল। তখন দরবারের একজন পাদ্রী বলিলেন, আমরা আপনাকে অত্যন্ত বিষন্ন দেখিতেছি। (কারণ কি?) ইবনে নাতুর বলেন, হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। যখন দরবারের লোকেরা চিন্তার কারণ জিজ্ঞাসা করিল তখন হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আজ রাত্রে আমি জ্যোতিবিদ্যার গণনা দ্বারা জানিতে পারিয়াছি যে, খত্‌নাধারী জাতির বাদশাহ জয়লাভ করিয়াছেন।† অতএব দেখা দরকার বর্তমান জাতি নিচয়ের মধ্যে কোন্ জাতি খত্‌না করে। দরবারের সকলেই বলিল, ইহুদী জাতি ভিন্ন অন্য জাতি খত্‌না করে না। কিন্তু ইহুদী জাতি এত দুর্বলচেতা, বিচ্ছিন্ন ও ছত্রভঙ্গ যে, ইহাদের জন্য আপনি মোটেই চিন্তা করিবেন না। অবশ্য রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশের শাসনকর্তাগণকে আপনি লিখিয়া পাঠান যে, ইহুদী জাতিকে যেন সমূলে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা হইতেছিল এমন সময় হেরাক্লিয়াসের দরবারে একজন লোককে উপস্থিত করা হইল যাহাকে গাস্‌সানের শাসনকর্তা পাঠাইয়াছিলেন; সেই লোকটি রসুলুল্লার খবর বলিতেছিল। সেই লোকটির নিকট যখন হেরাক্লিয়াস সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন তখন দরবারের লোকদিগকে আদেশ করিলেন, দেখ—এই লোকটির খাত্‌না করান কি না? সকলে অনুসন্ধান করিয়া বলিল, হাঁ—সে খাত্‌না করানো এবং তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল, আরবজাতি সকলেই খত্‌না করিয়া থাকে। অতঃপর হেরাক্লিয়াস বলিলেন, ইহারাই বর্তমান যুগের বাদশাহ। আমি জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে ইহাদেরই বিজয় ঘোষণা করা হইয়াছে।

---

† হেরাক্লিয়াস জ্যোতিষ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তদ্বারাই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা দেখা যায় কদাচিৎ উহার কোনও কোনটা প্রকৃত ঘটনার সঙ্গেও খাপ খাইয়া যায়। যেমন, এই ক্ষেত্রে ঘটিয়াছিল—ঐ সময় কোরায়েশগণ রসুলুল্লার (দঃ) সঙ্গে ছোলেহ-হোদায়বিয়ার সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ছোলেহ ও সন্ধিই রসুলুল্লাহ (দঃ) তথা মোসলেম জাতির বিজয় ঘোষণা করিয়াছিল। কারণ, ইতিপূর্বে কোথাও মোসলেম জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হইয়াছিল না। হোদায়বিয়ার ঘটনাতে আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় কোরায়েশগণ দলবদ্ধভাবে সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায় স্বাধীন জাতি ও শক্তি হিসাবে মোসলমান জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হইল। এখান হইতেই রসুলুল্লার (দঃ) তথা মোসলেম জাতির জয়ের সূচনা হয়। হেরাক্লিয়াস জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা তাহাই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন পন্থীদের জন্য তাহাদের নিজ নিজ পন্থায় রসুলুল্লাহ (দঃ)র আবির্ভাব ও বিজয়বার্তা প্রকাশ করিয়াছিলেন; যেন কাহারও কোন ওজর আপত্তির সুযোগ না থাকে।

আল্লাহ তায়ালা অনেক গ্রহ-নক্ষত্রকে নানারূপ পরিবর্তন ও বিষয় বস্তুর আবির্ভাবের আলামত ও নিদর্শন বা কার্যকারণ স্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন। কোন কোন গ্রহ নক্ষত্রের এই

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

তারপর হেরাক্লিয়াস রোম শহরে তাঁহার জনৈক বন্ধু—তিনি জ্যোতিষ শাস্ত্রে ও পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে হেরাক্লিয়াস সমতুল্য বিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিলেন, তাঁহার নিকট এই বিষয়ে পত্র লিখিলেন এবং ইলিয়া হইতে হেমছ শহরে গমন করিলেন। হেমস শহরে থাকা অবস্থায়ই রোমের সেই বন্ধুর উত্তর পাইলেন। উত্তরে তিনি হেরাক্লিয়াসের সঙ্গে একমত হইয়া মন্তব্য করিলেন যে, আখেরী যমানার নবী আবির্ভূত হইয়াছেন এবং আরবের তিনিই সেই নবী।

অতঃপর হেমস শহরেই হেরাক্লিয়াস রোম সাম্রাজ্যের সমস্ত বড় বড় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে ডাকিয়া আনিলেন, একটি দ্বিতল রাজপ্রাসাদের চত্বরে তাঁহাদিগকে একত্রিত করিয়া বাহিরে যাওয়ার সমস্ত পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তারপর হেরাক্লিয়াস উপরতলা হইতে লোকদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হে রোমবাসিগণ! যদি ইহ-পরকালের মুক্তি ও মঙ্গল চাও এবং রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও সমৃদ্ধি কামনা কর, তবে তোমরা এই নবীর হাতে 'বায়আত'—দীক্ষা গ্রহণ কর; তাঁহার আনুগত্যের অঙ্গিকারে আবদ্ধ হইয়া যাও। মাত্র এতটুকু বলার সঙ্গে সঙ্গেই দরবারস্থ লোকগণ জংলী গাধার ন্যায় চীৎকার করিতে করিতে বহির্গমনের জন্য ছুটিয়া চলিল, কিন্তু দরওয়াজাসমূহ বন্ধ থাকায় তাহারা বাহির হইতে পারিল না; যেহেতু পূর্ব হইতেই এই ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। হেরাক্লিয়াস এই

প্রভাবকে আল্লাহ তায়ালা চাক্ষুস প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন—যেমন সূর্য্যের তাছির ও কার্য্যকারিতায় দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে ও ঋতুর পরিবর্তন হয়, চন্দ্রের তাছিরে জোয়ার ভাটা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপ অনেক গ্রহ নক্ষত্রের সঙ্গেই আল্লাহ তায়ালা জাগতিক পরিবর্তনের যোগাযোগ রাখিয়াছেন। কোনও একজন পয়গাম্বরকে আল্লাহ তায়ালা এ বিষয় বিস্তারিত জ্ঞান দান করিয়াছিলেন। কিন্তু বহু পূর্বেই এই বিদ্যার আসল বিষয় বস্তুগুলি জগৎ হইতে লোপ পাইয়া যায়। পরবর্তী জ্যোতিবিদগণ এ বিষয় তাহাদের জ্ঞানের দাবী করে বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদের কোন জ্ঞানই নাই। কারণ, আসল বিদ্যা বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ার পর সঠিকভাবে গণনা করার ক্ষমতা কাহারও হইতে পারে না। তাই অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় জ্যোতিষীদের গণনা শতকরা নিরানব্বইটাই মিথ্যা ও ভুল প্রমাণিত হয়। আন্দাজে ঢিল ছোড়ার ন্যায় কোনও একটা হয়ত লক্ষ্য বস্তুতে লাগিয়া যায় এবং প্রচারের সময় ঐ একটাই সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। তা-ছাড়া এসব বিষয়ের চর্চায় সাধারণ্যে একটি মারাত্মক ক্ষতিকর ধারণার সূত্রপাত এই হয় যে, জাগতিক পরিবর্তন ও সাধারণ ঘটনা সমূহের মধ্যে কেবলমাত্র ঐ সমস্ত নগণ্য সৃষ্ট পদার্থগুলির অপরিহার্য্য প্রভাব, শক্তি, ক্ষমতা ও দক্ষতার ধারণাই মনের কোণে জাগিয়া উঠে। এরূপ ধারণা শেরেক ও কুফুরী। এক হাদীছে আছে—"কোন এক রাত্রে বৃষ্টিপাত হইল, আল্লাহ তায়ালা বলিলেন, ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক এই বৃষ্টির ব্যাপারে কাফের সাজিবে—তাহারা বলিবে যে, "অমুক নক্ষত্রের দ্বারা বৃষ্টিপাত হইয়াছে"। প্রচলিত জ্যোতিবিদ্যায় এরূপ অত্যাধিক ভুল, মিথ্যা ও শেরেক এবং কুফুরীর সূত্রসমূহ বিদ্যমান থাকায় উহা শিক্ষা ও বিশ্বাস করা শরীয়তে একেবারে হারাম সাব্যস্ত করা হইয়াছে।

দৃশ্য দর্শনে লোকদের ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়া গেলেন। (তিনি নিশ্চিতরূপে ধরিয়া লইলেন যে, রসুলুল্লার প্রতি তাঁহার যে, ভাবের উদয় হইয়াছে এবং যেই ভাবাবেগের ফলে তিনি পূর্ব মন্তব্যসমূহ করিয়াছিলেন সেই ভাবের উপর চলিতে থাকিলে তাঁহার হাতে রাজত্ব থাকিবে না। তাই তিনি রাজত্বের লোভে ও ক্ষমতার মোহে তাঁহার সেই উপস্থিত ভাবকে বিসর্জন দিয়া দেশবাসীকে যেই সত্য কথা বলিয়াছিলেন উহার মোড় ঘুরাইয়া দিলেন।) তিনি পুনঃ লোকদিগকে ডাকাইয়া বলিলেন, ওহে! আমি তোমাদিগকে ইতিপূর্বে যাহা কিছু বলিয়াছি তদ্দ্বারা তোমাদের নিজ ধর্মের উপর কতটুকু আস্থা ও দৃঢ়তা আছে তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছি। সেমতে আমি দেখিতেছি, স্বীয় ধর্মের প্রতি তোমাদের পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রহিয়াছে। এই ব্যাখ্যা শুনিয়া জনসাধারণ তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইল এবং সমবেতভাবে তাঁহাকে সেজদা করিয়া চলিয়া গেল। এই ছিল হেরাক্লিয়াসের শেষ অবস্থা।✡

বিশেষ দ্রষ্টব্য:—এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য—অধুনা অনেকেই এই বিষয়টি বুঝিতে মারাত্মক ভুল করিয়া থাকে। অর্থাৎ হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি যে প্রকাশ্য আহ্বান জানাইলেন যে, যদি তোমরা ইহ-পরকালের মুক্তি কামনা কর, তবে এই নবীর প্রতি আনুগত্য স্বীকার কর। এতদসত্ত্বেও হেরাক্লিয়াস মোমেন ও মুসলমান বলিয়া গণ্য হন নাই। এক হাদীছে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, (এই ঘটনার

✡ এখানে একই ঘটনার তিনটি খণ্ড উল্লেখ করা হইয়াছে: (১) আবু সুফিয়ানের বর্ণনা (২) ইবনে নাতুরের বর্ণনা (৩) হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর সঙ্গে পত্রালাপ। একই ঘটনা প্রবাহের এই তিনটি অংশ। এখানে একটি কথা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, দ্বিতীয় খণ্ডে উল্লেখিত আরববাসী লোকটি ও দেহ্ইয়া কালবী নামক পত্রবাহক ছাহাবী একই ব্যক্তি। তদ্রূপ গাসসানের শাসনকর্তা বোছরার শাসনকর্তাও একই ব্যক্তি। পূর্ণ ঘটনার ধারাবাহিক বিবরণ এই যে, সম্রাট হেরাক্লিয়াস ইলিয়া শহরে থাকাকালীন অবস্থায় জ্যোতিবিদ্যার দ্বারা খত্নাধারী জাতির বাদশার জয় অনুভব করিয়া নানারূপ জল্পনা-কল্পনায় রত ছিলেন। এদিকে তাঁহার উদ্দেশ্যে লিখিত রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর পত্রখানা লইয়া আরবাসী দেহ্ইয়া কালবী বোছরায় নিযুক্ত গাসসান কবিলার শাসনকর্তা মারফত তাঁহার নিকট পৌঁছিলেন, তখন দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত সমস্ত ঘটনা ঘটিল। হেরাক্লিয়াস তখন পত্র প্রেরকের পরিচয় মোটামুটি জানিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার হাল হকিকত পূর্ণভাবে অবগত হইবার জন্য পত্র খুলিয়া পাঠ করিবার পূর্বেই আবু সুফিয়ানের দলকে ডাকা হয় এবং প্রথম বর্ণিত ঘটনা ঘটে। হট্টগোলের ভিতর দিয়া হেরাক্লিয়াসের দরবার ভাঙ্গিয়া গেলে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার কথা জনসাধারণ গ্রহণ করিবে না। তাই তিনি রোম নিবাসী নাছারাদের প্রসিদ্ধ আলেম সর্বশ্রেষ্ঠ পাদ্রীর নিকট বিস্তারিত বিষয় লিখিয়া চিঠি দিলেন এবং ইলিয়া ত্যাগ করিয়া দেশের বিশিষ্ট শহর হেমসে চলিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া ঐ পাদ্রীর নিকট হইতে উত্তর পাইলেন। পাদ্রীকে তাঁহার সহিত একমত দেখিয়া দেশবাসীকে এই সত্য নবীর আনুগত্যের আহ্বান জানাইবার সাহস করিলেন এবং তৃতীয় খণ্ডে বর্ণিত ঘটনা সংঘটিত হইল।

আনুমানিক দুই বৎসর পর) তবুকের যুদ্ধের সময় হেরাক্লিয়াস রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর নিকট পত্র লিখিয়াছেন এবং তাহাতে তিনি নিজেকে মুসলমান বলিয়া উল্লেখ করেন। রসুলুল্লাহ (দঃ) উহা দেখিয়া বলিয়াছেন—

كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرانيته

'মিথ্যাবাদী খোদার দুষমন। ধোকাবাজী করিয়াছে; সে কস্মিনকালেও মুসলমান নহে; বরং সে এখনও নাছরানী ধর্মের উপরই রহিয়াছে। এখানে অনেকের মনেই প্রশ্ন উদয় হইবে যে, রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি এত সুন্দর মর্য্যাদাপূর্ণ সম্মানসূচক মন্তব্যকারী হেরাক্লিয়াসের স্থায় ব্যক্তি মুসলমান বলিয়া গণ্য হইল না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য ইসলাম ও ঈমানের পূর্ণ হাকিকত ও তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা একান্ত আবশ্যক।

ঈমানের হাকিকত বা তাৎপর্য্যঃ

মানুষের মধ্যে শুধু জ্ঞান ও বিবেক বস্তুই নহে—বরং কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপুও আছে। যাঁহারা সাধনা করিয়া সংযম অভ্যাস করিয়া জ্ঞানের দ্বারা রিপুকে জয় করিতে পারেন তাঁহারাই মানুষ হইতে পারেন; নতুবা শুধু জ্ঞান অর্জনের দ্বারা মানুষ প্রকৃত মানুষ হইতে পারে না। হেরাক্লিয়াস ইতিপূর্বে আসমানী কেতাবের বা জ্যোতিষ-শাস্ত্রের প্রমাণ অনুসারে ভাবাবেগ বশতঃ যাহা কিছু মন্তব্য করিয়াছিলেন তাঁহার মূলে শুধু তাঁহার জ্ঞান ও পরিচয় লাভই ছিল। কিন্তু ঈমান রত্ন হাসিলের জন্য শুধু ভাবের উদয় ও জ্ঞানই যথেষ্ট নহে, বরং উদীয়মান ভাব ও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব প্রকার ভয়-ভীতি, মোহ ও লালসা এবং সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কার ইত্যাদিকে বিসর্জন দিয়া ত্যাগ স্বীকার করতঃ পূর্ণভাবে আল্লাহ এবং আল্লার রসুলের প্রতি আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার করা এবং জীবনের সর্বস্তরে সেই আনুগত্য প্রয়োগের প্রস্তুতি মনে-প্রাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা ব্যতিরেকে ঈমানও হাসিল হয় না, মুক্তিও পাওয়া যায় না। স্বার্থোদ্ধার বা স্বার্থহানির অপচিন্তা কিম্বা সামাজিক বিধিবন্ধন ও সংস্কারের মোহ ইত্যাদির সংঘর্ষের সময় নফছের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া দৃঢ় বিশ্বাস সহকারে পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য স্বীকার এবং মনে-প্রাণে সেই আনুগত্যের প্রস্তুতি গ্রহণ করা ব্যতিরেকে যে ঈমান হাসিল হয় না তাহার প্রমাণ কোরআন শরীফেই পরিষ্কার উল্লেখ রহিয়াছে—يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ অর্থাৎ—"ইহুদী ও নাছারাদের মধ্যে এমন বহু লোক আছে যাহাদের রসুলুল্লার পরিচয় ও জ্ঞান এরূপ হাসিল রহিয়াছে যেরূপ তাহাদের স্বীয় সন্তান সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট পরিচয় হাসিল আছে।"

কিন্তু যেহেতু তাহারা এই পরিচয় ও জ্ঞানের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ও পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে নাই, তাই তাহারা ঈমানদার গণ্য হয় নাই—কাফেরই রহিয়া গিয়াছে।

হেরাক্লিয়াসের জ্ঞান ছিল, ভাবাবেগও অত্যধিক ছিল, কিন্তু স্বার্থের অর্থাৎ রাজত্বের চিন্তা ছিল ততোধিক। যদি তিনি এই স্বার্থের লোভ ও রাজত্বের মোহকে সত্যের

খাতিরে ত্যাগ করিতে পারিতেন তবেই তিনি মুক্তি পাইতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিতে পারেন নাই। যখন তিনি দেখিলেন যে, সত্যকে স্বীকার করিয়া লইলে তাঁহার স্বার্থে আঘাত লাগিবে, রাজত্ব চলিয়া যাইবে, তখনই তিনি উদীয়মান ভাবকে প্রতিহত করিতে লাগিলেন এবং কথাবার্তার মধ্যে "যদি আমি বুঝি" ইত্যাদি দুর্বলতাসূচক ভাব প্রকাশ করিলেন। অবশেষে স্বউদিত ভাবকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিলেন এবং দেশবাসীকে যে সত্যের ডাক শুনাইয়াছিলেন উহার বিকৃত অর্থ করিয়া অবিচলিত চিত্তে সত্যধর্ম গ্রহণ করার মত সৎসাহস হইতে বিরত রহিলেন। কাজেই তিনি ইসলাম ও ঈমান রত্ন হইতে বঞ্চিত থাকিয়া গেলেন। পক্ষান্তরে অবিচলরূপে অকাতরে এবং নির্ভয়ে সত্যকে গ্রহণ করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হেরাক্লিয়াসেরই বন্ধুর ঘটনায় সুন্দররূপে উপলব্ধি করা যায়; যাহা ছিল প্রকৃত ঈমান।

হেরাক্লিয়াসের বন্ধুর ঘটনা:

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে যে, রোম শহরে হেরাক্লিয়াসের এক বন্ধু ছিলেন, যাঁহার নিকট হেরাক্লিয়াস সম্পূর্ণ ঘটনার বিবরণ দিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। সেই বন্ধুটির নাম ছিল "জাগাতের"। হেরাক্লিয়াস তাঁহার নিকট পত্র লিখার পর পত্রবাহক ছাহাবী দেহ্ইয়া (রাঃ)কে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, রোম শহরে একজন বড় পাদ্রী আছেন তাঁহার নাম জাগাতের। রোমবাসীগণ তাঁহার অত্যধিক অনুগত। আপনি তাঁহার নিকট রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা নিয়া উপস্থিত হউন। তিনি রোমবাসীগণকে আহ্বান জানাইলে আশা করা যায় তাহারা তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিবে। দেহ্ইয়া (রাঃ) পত্রখানা লইয়া জাগাতের নিকট উপস্থিত হইলেন। জাগাতের রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা পাঠ মাত্র রসুলুল্লার প্রতি অগাধ বিশ্বাসে তাঁহার মন-প্রাণ ভরিয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি খৃষ্টানী পোষাক ত্যাগ করিয়া নূতন পোষাক পরিধান করতঃ কোনরূপ ইতস্ততঃ ব্যতিরেকে সত্যধর্ম ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দান পূর্বক খোলাখুলি ভাবে রোমবাসীদিগকে ইসলামের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাইলেন। রোমবাসীগণ সংস্কারাচ্ছন্ন থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না, বরং অতি মাত্রায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে ভীষণ প্রহারে মারিয়া ফেলিল দেহ্ইয়া (রাঃ) হেরাক্লিয়াসের নিকট ফিরিয়া আসিয়া জাগাতেরের সকল অবস্থা বর্ণনা করিলেন। হেরাক্লিয়াস উহা শুনিয়া বলিলেন, আমিত পুর্বেই বলিয়াছিলাম যে, আমার ভয় হয়, ইসলাম গ্রহণ করিলে খৃষ্টানগণ আমাকে মারিয়া ফেলিবে। দেখুন জাগাতের রোমবাসীদের নিকট আমার তুলনায় অধিক শ্রদ্ধেয় ছিলেন, তবুও তিনি বাঁচিতে পারিলেন না। (ফতহুল-বারী ১—৩৬)

আরও একটি মর্মান্তিক ঘটনা:

দেহ্ইয়া (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, রোমবাসীগণ হেরাক্লিয়াসের দরবার হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তিনি আমাকে ডাকিলেন এবং একজন প্রধান পাদ্রীকেও ডাকাইয়া আনিলেন।

সমস্ত রোমবাসীদের উপর এই পাদ্রীর অতিশয় প্রাধান্য, তিনি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রখানা দেখা মাত্রই বলিলেন—ইনিই সেই আখেরী যামানার নবী যাঁহার শুভাগমনের সুসংবাদ হযরত ঈসা (আঃ) দিয়াছিলেন। যে যাহাই বলুক, অথবা আমাকে মারিয়া ফেলুক, আমি তাঁহার উপর ঈমান আনিবই এবং তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও তাঁহার অনুসরণ করিবই। হেরাক্লিয়াস বলিলেন—আমি এইরূপ করিলে ত আমার রাজত্ব থাকিবে না। তখন ঐ পাদ্রী পত্রবাহক দেহ্ইয়া (রাঃ)কে বলিলেন, আপনি এই পত্রদাতা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট যান এবং তাঁহার খেদমতে আমার সালাম পেশ করিয়া এই সংবাদ দিবেন যে, আমি "আশ্‌হাদু আল-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মোহাম্মাদার রসুলুল্লাহ" পড়িয়া তাঁহার উপর ঈমান আনিয়াছি। তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও গ্রহণ করিয়াছি। রোমবাসী আমার কথা মানে নাই। এই বলিয়া তিনি রোমবাসীকে সত্য ধর্মের আহ্বান জানাইলে তাহারা তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। (ফতহুল-বারী ১—৩৬)

পাঠকবৃন্দ। লক্ষ্য করুন, "জাগাতের" ও এই পাদ্রী স্বীয় প্রাধান্য, মান-সম্মান, ভয় ভীতি বা সংস্কার ইত্যাদির প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে ইসলাম গ্রহণ-পূর্বক রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের আনুগত্য মানিয়া লইতে কোন প্রকার ইতস্ততঃ বা দ্বিধা বোধ করিলেন না, ইহাকে বলে প্রকৃত ঈমান। হেরাক্লিয়াস কিন্তু এইরূপ করিতে পারেন নাই। তিনি সর্বদাই "রাজত্ব চলিয়া যাইবে" এই ভয়ে ভীত ছিলেন। তিনি পত্রবাহক দেহ্ইয়া (রাঃ)কে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—আমি জানি যে, তিনি আল্লার প্রেরিত সত্য নবী, কিন্তু আমি আমার দেশবাসীকে ভয় করি, তাহারা আমাকে মারিয়া ফেলিবে এবং আমার রাজত্ব চলিয়া যাইবে, নতুবা আমি তাহার আনুগত্য গ্রহণ করিতাম। (ফতহুল-বারী ১—৩১)

হেরাক্লিয়াসের অবস্থা এই ছিল যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমুহের প্রমাণাদি ও জ্যোতির্বিদ্যার নিদর্শনাবলীর প্রভাবেই তাঁহার অন্তরে ঐ প্রকার ভাবাবেগের উদয় হইয়াছিল। পরন্তু তিনি ইচ্ছাকৃত কিছুই করেন নাই, পক্ষান্তরে তিনি ঐ স্বউদিত ভাবকে চাপিয়া রাখিতেই চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য পরিচালনাও করিয়াছিলেন। (ফতহুল-বারী ১— ৩১)

এতদ্ভিন্ন ৯ম হিজরী সনে যে, স্বয়ং নবী (দঃ) ত্রিশ সহস্র মোজাহেদ লইয়া তবুকের জেহাদে প্রায় তিন শত মাইল অগ্রসর হইয়াছিলেন উক্ত জেহাদের প্রতিপক্ষ মূলতঃ রোমান-বাহিনীই ছিল। এবং তখনও রোমের শাসনকর্তা এই হেরাক্লই ছিল; সে মদীনা আক্রমণের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিল।

নবী (দঃ) ঐ পরিস্থিতিতেও তাহাকে ইসলামের আহ্বান জানাইয়া দ্বিতীয় আর এক-খানা পত্র এই দেহ্ইয়া (রাঃ) মারফৎই পাঠাইয়াছিলেন। তখনও তিনি অম্লান চিত্তে

ইসলাম গ্রহণে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময় তিনি নবীজীর পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন এবং লিখিয়াছিলেন, "ইন্নী মোছলেমোন"—অর্থাৎ আমি ইসলাম গ্রহণকারী হইয়াছি। কিন্তু নবী (দঃ) তাঁহার এই দাবীকে মোনাফেকী সাব্যস্ত করাপূর্বক বলিয়াছিলেন, كذب عدو الله ليس بمسلم بل هو على نصرانيته—আল্লাহর দুশমন মিথ্যা বলিয়াছে, সে ইসলাম গ্রহণ করে নাই, বরং সে খৃষ্টানই রহিয়াছে। (ফতহুল বারী ১—৩১)

রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের সুফল ঃ

হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) আল্লার অতি প্রিয় মাহবুব; তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন বিফল যায় না। তাঁহার মর্য্যাদা রক্ষাকারীকে আল্লাহ তায়ালা প্রতিদান দিয়া থাকেন; সে কাফের হইলে চির জাহান্নামী হওয়া হইতে অব্যাহতি পায় না, কিন্তু জাহান্নামে আজাব ভোগ অবস্থায়ও উহার ফল ভোগ করিতে পারে। যেমন, আবু লাহাবের ন্যায় মৃত্ কাফের যাহার চিরআজাবগ্রস্ত হওয়া অকাট্য প্রমাণে প্রমাণিত; সে প্রতি সোমবারে তাহার দুইটি অঙ্গুলীর মধ্য হইতে শীতল পানীয় পাইয়া থাকে, শুধু এই জন্যে যে, হযরতের ভূমিষ্ঠ হওয়ার সুসংবাদে আনন্দিত হইয়া সুসংবাদ প্রদানকারিণী ক্রীতদাসীকে ঐ দুইটি অঙ্গুলীর ইশারা করতঃ মুক্তি দিয়াছিল।

হেরাক্লিয়াস স্বীয় দোষে ঈমান হইতে মাহরুম ও বঞ্চিত রহিয়াছিল, কিন্তু রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের চিঠিকে সে সম্মান করিয়াছিল, তজ্জন্য শুধু তাহাকেই নয়, তাহার বংশধরকেও আল্লাহ তায়ালা উহার সুফল প্রদান করিয়াছেন। ইতিহাসে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ (দঃ) হেরাক্লিয়াস কর্তৃক তাঁহার পত্রের সম্মান প্রদর্শনের কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, ثبت الله ملكه "আল্লাহ তাহার রাজ্যকে কায়েম রাখুন।" আল্লার প্রিয় নবীর এই আশীর্বাদ বাণী বৃথা যায় নাই। বরং এই সৎকার্য্যের ফলেই রোমানদের রাজ্য ধ্বংস হয় নাই, বহুকাল তাহাদের মধ্যে রাজত্ব চলিয়াছিল। কারণ তাঁহার ঐ পত্রখানাকে রেশমী কাপড়ে জড়াইয়া সোনার সিন্দুকে সযত্নে রাখিয়া দিয়াছিল এবং বংশ পরম্পরায় তাহারা একে অন্যকে এই অছিয়ত করিয়া যাইত যে, এই পত্রখানা বিশেষ যত্ন সহকারে রাখিও। যাবৎ ইহা আমাদের হাতে থাকিবে তাবৎ আমাদের রাজত্ব কায়েম থাকিবে। পক্ষান্তরে পারস্য সম্রাট হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের পত্রের অবমাননা করিয়াছিল, রাগান্বিত হইয়া উহাকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়াছিল। রসুলুল্লাহ (দঃ) এই সংবাদ শুনিয়া বদ দোয়া করিয়া বলিয়াছিলেন, "হে আল্লাহ! তাহাকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলুন।" ফলে অল্পকালের মধ্যেই পারস্য সম্রাট সবংশে জগতের বুক হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছিল। (ফতহুলবারী)

প্রথম অধ্যায়

ঈমান

পাঁচটি মৌলিক জিনিসের উপর ইসলাম ধর্মের ভিত্তি স্থাপিত। উহাদের মধ্যে সর্ব প্রধান হইতেছে 'ঈমান'। ঈমান কাহাকে বলে?

আল্লার নিকট হইতে হযরত মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম যাহা কিছু বহন করিয়া আনিয়া কোরআনরূপে এবং হাদীছের মাধ্যমে মানব জাতিকে দান করিয়াছেন ঐ সবকে অন্তরের সহিত বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকার করিয়া কার্য্যে পরিণত করার জন্য প্রস্তুত থাকাকে 'ঈমান' বলে। অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস রাখিয়া মুখে স্বীকার করতঃ আল্লাহ তায়ালার সমুদয় আদেশ নিষেধগুলিকে ব্যবহারিক জীবনে কার্য্যে পরিণত করার নাম ইসলাম। সমস্ত আদেশ নিষেধগুলিকে কার্য্যে পরিণত করার সৌকর্য্য এবং আন্তরিক বিশ্বাসের দৃঢ়তার প্রতিফলনের তারতম্য অনুপাতে ঈমানের উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে। কোরআন শরীফের বহু আয়াতে এই উন্নতি ও অবনতির প্রতি ইঙ্গিত রহিয়াছে। এ ছাড়া ঈমানের বহু শাখা প্রশাখাও আছে। যেমন—আল্লার প্রিয় ব্যক্তি, বস্তু ও কার্য্যকে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় যাবতীয় বস্তুকে অপছন্দ করা ঈমানের একটি শাখা। স্বীয় চরিত্রে ঐ শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ও অস্তিত্বের কম বেশী হওয়ার দরুনও ঈমানের উন্নতি-অবনতি হইয়া থাকে।

আরবী ভাষায় ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস। কিন্তু যে ঈমান মানব জাতির কল্যাণের উৎস এবং পরকালের নাজাত, মুক্তি ও সুখ-শান্তির একমাত্র পথ সে ঈমান শুধু মাত্র বিশ্বাসের নামই নহে। বরং সেই ঈমান-রত্ন বহু সাধনার ধন। সাধনা ব্যতিরেকে ঐ অমূল্য রত্ন হাসিলও হয় না, রক্ষিতও হয় না। এই বিষয়টি বুঝাইবার জন্যই বোখারী (রঃ) কয়েকজন মনীষীর কয়েকটি মূল্যবান কথার উল্লেখ করিতেছেন।

ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (রঃ) খোলাফায়ে-রাশেদীনগণের অনুরূপ খলীফা ও বিশিষ্ট তাবেয়ী ছিলেন। একদা তিনি তাঁহার আলজেরিয়াস্থ গভর্ণরকে একটি হেদায়েত-নামা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। উহাতে তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন—"নিশ্চয় জানিও ঈমানের অন্তর্গত বিভিন্ন পর্য্যায়ের অনেকগুলি বিষয়বস্তু রহিয়াছে—(১) ফরয ও ওয়াজেবসমূহ, (যেগুলি অবশ্য করণীয়, যেমন—আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য স্বীকার করতঃ কলেমা পড়া, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়া, রমযানের রোযা রাখা, যাকাৎ দান করা, হজ্জ করা, দ্বীনের এল্‌ম শিখা, জেহাদ করা ইত্যাদি।) (২) মশরু" বা জায়েয বিষয়সমূহ (যে গুলির উপর মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগ করিয়া কাজ করার জন্য আল্লাহ তায়ালার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছে)। (৩) নির্দ্ধারিত সীমা সমূহ, (অনেক স্থলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্মশক্তি প্রয়োগের অনুমতি দিয়াছেন, কিন্তু কোন স্থানেই তাহাকে লাগামহীন ছাড়িয়া দেন নাই। বরং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আল্লাহ তায়ালা সীমা নির্দ্ধারিত

করিয়া দিয়াছেন সেই সকল সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি মোটেই নাই। যেমন—আল্লাহ তায়ালা মানুষকে চক্ষু দান করিয়াছেন এবং তদ্বারা জাগতিক কাজকর্ম দেখা ও আল্লার সৃষ্টি জগতের নৈপুণ্য দেখিয়া জ্ঞান আহরণ করার অনুমতি দিয়াছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন যে, শরীয়তের নিষিদ্ধ বস্তু দেখিতে পারিবে না। যেমন—অন্যের ছতর (গুপ্তস্থান) দেখা; বেগানা স্ত্রীলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ইত্যাদি। এইরূপে মানুষের প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় ও শক্তিকে পরিচালিত করিবার অনুমতি আল্লাহ তায়াল দিয়াছেন বটে, কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই সীমা নির্দ্ধারিত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ঐ নির্দ্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করা মহাপাপ) (৪) সুন্নাহ—অর্থাৎ রসুলুল্লাহ (দঃ) এবং তাঁহার খোলাফায়ে-রাশেদীনের আদর্শসমূহ। (এই আদর্শসমূহ হইতে আদবকায়দা ও নিয়ম-পদ্ধতি গ্রহণ করিয়া তদনুযায়ী দৈনন্দিন জীবন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন, সাধনা, ভজনা, ও এবাদত বন্দেগীর জীবন, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন প্রভৃতিকে গঠিত ও পরিচালিত করিতে হইবে। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই ঐ পবিত্র আদর্শকে মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করা চলিবে না।) যাহারা ঈমানের অঙ্গ স্বরূপ উপরোক্ত চারিটি বিষয়-বস্তুকে পূর্ণরূপে আয়ত্ত ও রক্ষা করিবে তাহাদের ঈমান পূর্ণাঙ্গ হইবে। পক্ষান্তরে যাহারা এইগুলিকে যত্ন ও সাধনার সহিত পূর্ণ না করিবে তাহাদের ঈমান অঙ্গহীন ও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। অতএব বুঝা গেল যে ঈমান কেবলমাত্র বিশ্বাসের নামই নহে; কর্মময় জীবনের অন্তহীন সাধনা ও প্রযত্ন উহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ওমর ইবনে আবদুল আজিজ (রঃ) এ কথাও উক্ত চিঠিতে উল্লেখ করিয়াছেন যে—যদি আমি বাঁচিয়া থাকি, তবে আমি ঈমানের এই সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গ ও শাখা-প্রশাখা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা দান করিব, যাহাতে জনসাধারণের পক্ষে উহা বুঝিতে ও তদনুযায়ী আমল করিতে সহজ হয়। আর যদি আমি মরিয়া যাই, তবে জানিয়া রাখিও—তোমাদের সংসর্গে থাকিয়া হুকুমত করার আদৌ কোন অভিপ্রায় আমার নাই।"

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলিয়াছেন— ليطمئن قلبي

অর্থাৎ আমি আমার অন্তরের সমস্ত অছ্অছাহ্ (মানবীয় দুর্বলতা) দূর করতঃ একীন ও বিশ্বাসকে গাঢ় হইতে গাঢ়তর করিয়া ঈমানের উন্নতি সাধন করিতে চাই।

ছাহাবী মোয়ায (রাঃ) তাঁহার সঙ্গীদিগকে বলিতেন—ভাই! একটু বস; কিছুক্ষণ আমরা (দ্বীনের কথা, আল্লাহ ও রসুলের কথা আলোচনা করিয়া) ঈমানকে বর্দ্ধিত ও উন্নত করি।

ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে মসউদ (রাঃ) বলিতেন—প্রতিবন্ধকতায় কর্মজীবন এবং ত্যাগ তিতিক্ষা ও কষ্ট-ক্লেশের পরীক্ষার ভিতর দিয়া যে অটল বিশ্বাস প্রমাণিত হয় উহাই আসল পূর্ণাঙ্গ ঈমান। ঐরূপ বিশ্বাস ব্যতিরেকে শুধু মুখে বুলি আওড়ানো বা ভাবাবেগ প্রকাশের নাম ঈমান নহে।

আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলিতেন—প্রত্যেক জিনিসেরই কোন না কোন গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকিবেই; এই সব গুণাগুণ বা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারাই জিনিষটির পরিচয় হয়। সেমতে ঈমানেরও কতিপয় গুণ এবং প্রতিক্রিয়া আছে—উহা এই যে, ঈমানদার ব্যক্তির আল্লার উপর বিশ্বাস এবং ভয় ও ভক্তি এত বাড়িয়া যায় যে, (আল্লার স্পষ্ট আদিষ্ট কাজগুলি ত করেই এবং নিষিদ্ধ কাজগুলিও চিরতরে বর্জন করে। এতদ্ব্যতীত) যে কোন কাজে বা কথায় তাহার মনে যদি সামান্য মাত্র খটকা বা সংশয়ের উদয় হয় যে, হয়ত এই কাজটি বা কথাটি পরিণামে আল্লার অসন্তুষ্টির কারণ হইতে পারে বা ইহাতে আল্লার অনুমোদন না থাকিতে পারে, ঈমানের প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহাও সে বর্জন করিয়া চলে। মানুষের জীবনে এই অবস্থা যখন উপস্থিত হয়, তখনই তাহার ঈমান পূর্ণতা লাভ করে এবং খাঁটী তাকওয়া তাহার হাসিল হয়। কোরআন শরীফের একটি আয়াতে আছে:—

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّالَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ

অর্থ:—আল্লাহ তায়ালা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)কে এবং নূহ, ইব্রাহীম, মূছা ও ঈছাকে (এতদ্ভিন্ন সমস্ত পয়গাম্বরগণকে) একই ধর্ম এবং একই ঈমান ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার আদেশ করিয়াছেন; এবং ইহাও বলিয়া দিয়াছেন যে, এই মূল ধর্মকে সকলে ঠিক রাখ—ইহাতে বিভিন্ন মত পোষণ করিও না।

অন্য এক আয়াতে আছে:— لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًا

অর্থ:—তোমাদের প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পথ এবং ভিন্ন ভিন্ন তরিকা ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছি।

উক্ত আয়াতদ্বয়ের সমষ্টিগত তৎপর্য্য এই যে, বিভিন্ন নবীগণের শরীয়তের ধর্ম পালনের পদ্ধতি ও প্রণালীর এবং ধর্মাচরণের খুঁটিনাটি বিষয়ে হয়ত পার্থক্য আছে বটে; কিন্তু মূল ধর্মের ভিতরে কোন পার্থক্য নাই। এক আল্লার দাসত্ব স্বীকার করতঃ একান্ত অনুগত হইয়া তাঁহার আদেশ পালনার্থে প্রতিযোগিতা করিয়া নেক কাজে অগ্রসর হওয়াই ঈমানের আসল মূল। এখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি ও আচরণের পার্থক্য স্বরূপ বলা যায়—যেমন নামায কায়েম করার হুকুম প্রত্যেক নবীর শরীয়তেই ছিল, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামায়াতে আদায় করার হুকুম হইয়াছে শুধু শেষ নবী মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শরীয়তে।

অন্য এক আয়াতে আছে:— قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ

অর্থ:—তোমরা যদি আমার প্রভু আল্লাহকে না ডাক, তাঁহার নিকট প্রার্থনা না কর, তবে তাহাতে আমার প্রভুর কোনই ক্ষতি নাই।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) এখানে আল্লাহ তায়ালার নিকট প্রার্থনা (দোয়া) করাকে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অতএব সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, ঈমান রত্ন কত ব্যাপক ও সম্প্রসারিত এবং কত খুঁটিনাটি বিষয়বস্তু ইহার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। সুতরাং ঈমান শুধু বিশ্বাস করার নামই নহে।

ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিষের উপর

৭। হাদীছ ঃ— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلٰى خَمْسٍ شَهَادَةِ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ

وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ-

অর্থ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের সৌধ স্থাপিত। (১) এক আল্লাহই মাবুদ, অন্য কোনও মাবুদ (পূজনীয়) নাই, মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার রসুল; ইহা প্রকাশ্য-ভাবে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া লওয়া, (২) নামায পূর্ণাঙ্গরূপে আদায় করা, (৩) যাকাৎ দান করা, (৪) হজ্জ করা, (৫) রমযান মাসে রোযা রাখা।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার যে সমস্ত পন্থা আছে বা যত প্রকার নেক ও সৎকাজ আছে উহার প্রত্যেকটিই মূল ঈমানের শাখা-প্রশাখা; অতএব, ঈমানের শাখা অনেক। ইমাম বোখারী (রঃ) এখানে কোরআনের দুইটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন, যাহাতে মানব জাতির কল্যাণের ও সত্যিকারের মানুষ হওয়ার পন্থারূপে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা কয়েকটি মোটামুটি কাজ আঙ্গুলের উপর গণনা করিয়া দিয়াছেন। সেই হিসাবে আয়াত দুইটি অতি মূল্যবান ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তাই এখানে উহার ব্যাখ্যা বিশেষভাবে করা হইতেছে। প্রথম আয়াত ঃ—

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ-

وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ

وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ- وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ

اِذَا عٰهَدُوْا وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ- اُولٰٓئِكَ

الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ-

অর্থ :—প্রকৃত প্রস্তাবে নেক ও সৎকাজ এইগুলি :— (১) সর্ব প্রথমে মোটামুটি কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপনের দ্বারা দেল ও অন্তরকে ঠিক করিতে হইবে— (ক) আল্লাহকে বিশ্বাস করিয়া ভয় ও ভক্তির সহিত তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে এবং উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আল্লাহই আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতেই আমরা আসিয়াছি। (খ) আবার একদিন আমাদের সকলকেই আল্লার নিকট ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং বিচারের সম্মুখীন হইতে হইবে। চোখ, কান, হাত, পা, জ্ঞান, বুদ্ধি, আলো-বাতাস ধন-দৌলত ইত্যাদি যাহা কিছু নেয়ামত আল্লাহ তায়ালা আমাদিগকে দান করিয়াছেন, আমরা উহার সদ্ব্যবহার করিয়াছি কি অসদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহার হিসাব দিতে হইবে। সেই শেষ বিচারের দিনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের সদ্ব্যবহার কৃতঃ হিসাব দিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। (গ) ফেরেশতাদের সম্বন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা নিষ্পাপ, ত্রুটিহীন; কখনও আল্লার বিরুদ্ধাচরণ করেন না, বা তাঁহাদের দ্বারা কোন ভুল-ত্রুটি হওয়া সম্ভব নহে। তাঁহারা আল্লার বাণী পয়গাম্বরগণের নিকট অবিকলরূপে পৌছাইয়া দিয়াছেন, বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই এবং ইহাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নাই। (ঘ) আল্লার কোরআনকে পূর্ণভাবে বিশ্বাস করিতে হইবে যে. ইহার অন্তর্গত কোন একটি অক্ষরের মধ্যেও অদৌ কোনরূপ সন্দেহ দোষ বা ভুল-ত্রুটি নাই। (ঙ) আল্লার নবীগণের প্রতি পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে হইবে যে, তাঁহারা আল্লার প্রেরিত সম্পূর্ণ নিষ্পাপ মানুষ ও সত্য পথ প্রদর্শক ছিলেন। যে যুগের, যে দেশের বা যে জাতির জন্য যিনি নবী হইয়া আসিয়াছেন—সেই যুগের, সেই দেশের সমগ্র জাতি তাঁহাকেই আদর্শ পথপ্রদর্শকরূপে মানিয়া চলিতে হইবে, যেমন—কেয়ামত পর্য্যন্ত শেষ যুগের জন্য সমগ্র বিশ্বমানবের পয়গাম্বর হইলেন হযরত মোহাম্মদ (দঃ)। কেয়ামত পর্য্যন্ত সকলকে একমাত্র তাঁহারই আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে।

(২) পার্থিব ধন-দৌলত ও বিষয়-সম্পত্তির দিকে স্বভাবগত ভাবে মানুষের মনের মায়া ও আকর্ষণ থাকা সত্বেও আল্লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য ধন-সম্পত্তি যথাস্থানে দান করিতে হইবে। যথা—ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগকে, (পিতৃহীন, কর্মশক্তিহীন অসহায়) এতিম বালক বালিকাদিগকে, অভাবগ্রস্ত দরিদ্রদিগকে (যাহারা কঠোর পরিশ্রম করিয়াও অভাব মোচনে অক্ষম) পথিকদিগকে, (যাহারা প্রবাসে অভাবে পড়িয়াছে), যাচ্ঞাকারী ভিক্ষুকদিগকে, (যে সব অন্ধ, খঞ্জ, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আতুর ইত্যাদি কর্মশক্তিহীনতার দরুণ ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইতেছে।) এবং দাসত্বে আবদ্ধ মানুষকে, (তাহাদের মুক্তির জন্য) দান করিতে হইবে *

(৩) আল্লার নির্দেশিত এবং তাঁহার রসুলের (দঃ) প্রদর্শিত নিয়ম অনুযায়ী আল্লার দাসত্বের প্রতীক নামায কায়েম (পূর্ণাঙ্গে আদায় ও জারী) করিতে হইবে।

---

* এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, যাকাৎ ভিন্ন এই সমস্ত দানের স্থান সমূহ বর্ণিত হইল। ইহার পর যথাস্থানে যাকাতের উল্লেখ হইয়াছে।

(৪) স্বীয় ধনের চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাৎ স্বরূপ দিতে হইবে।

(৫) অঙ্গীকার করিলে উহা রক্ষা করিতে হইবে। (আল্লার সহিত অঙ্গীকার বা মানুষের সহিত অঙ্গীকার—সমস্ত অঙ্গীকারই অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে হইবে)।

(৬) ধৈর্য্যধারণের অভ্যাস করিতে হইবে। ভীষণ অভাবের তাড়নার সময়, দুর্বিসহ রোগ যাতনার সময় এবং শত্রুর আক্রমণ ইত্যাদি ভীষণ বিপদের সময়।

যাহারা এই সৎগুণাবলী অর্জন করিতে সক্ষম হইবে, তাহারাই খাঁটী সত্যবাদী এবং তাহারাই প্রকৃত ঈমানদার ও মোত্তাকী পরিগণিত হইবে। (২ পারা ৬ রুকু)

দ্বিতীয় আয়াত:—(১৮ পারা ১ রুকু)

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلٰوتِهِمْ خَاشِعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكٰوةِ فَاعِلُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَافِظُوْنَ ط اِلَّا عَلٰى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ - فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُوْنَ - وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ - اُولٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُوْنَ - الَّذِيْنَ يَرِثُوْنَ - الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ -

এই আয়াতে আল্লাহ তায়ালা মানব জীবনকে স্বার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য আটটি গুণ অর্জনের শর্ত উল্লেখে বলিতেছেন:

স্বীয় জীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিয়াছে তাহারা—

(১) যাহারা (আল্লাহ ও আল্লার রসুলকে মান্য করিয়া কেয়ামতের হিসাব নিকাশ, বেহেশত-দোযখকে বিশ্বাস করিয়া) ঈমানদার হইয়াছে।

(২) যাহারা ভয় ও ভক্তির সহিত, আল্লার দরবারে কাকুতি-মিনতির সহিত নামায কায়েম করিয়াছে।

(৩) যাহারা বৃথা সময় নষ্ট করা হইতে বিরত রহিয়াছে। (চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, দর্শনশক্তি, শ্রবণশক্তি, বাক্‌শক্তি, কর্মশক্তি, চলনশক্তি চিন্তাশক্তি, প্রভৃতি যে সব অমূল্য শক্তির সমারোহ আল্লাহ তায়ালা মানুষকে দান করিয়াছেন, ঐগুলিকে জীবনের স্থায়ী উন্নতিমূলক কার্য্যে ব্যয় করিবে। অবনতির বা অনর্থক কাজে অপচয় করা হইতে বিরত থাকিতে হইবে)।

(৪) যাহারা পবিত্রতা সাধন করিয়াছে। (আত্মার পবিত্রতা, দেহের পবিত্রতা, বস্ত্রের পবিত্রতা, স্ত্রীর পবিত্রতা, অর্থের পবিত্রতা, ইত্যাদি সর্ব প্রকারের পবিত্রতাই ইহার অন্তর্ভুক্ত। হিংসা, বিদ্বেষ, নির্দয়তা নিষ্ঠুরতা, আত্মম্ভরিতা, কৃপণতা, স্বার্থান্ধতা, ক্রোধান্ধতা, কপটতা, মোহান্ধতা, ইত্যাদি অপবিত্র স্বভাব সমূহ হইতে আত্মাকে শোধিত রাখিতে হইবে। সুদ, ঘুষ, শোষণ, দুর্নীতি, চুরি-জুয়াচুরি, ধোকাবাজী ইত্যাদি সর্ব প্রকার হারাম উপায় হইতে অর্থকে পবিত্র রাখিতে হইবে। তদুপরি শরীয়ত অনুযায়ী যাকাৎ দান করিতে হইবে। অর্থের উপরই মানুষের সর্বস্ব নির্ভর করে, তাই অর্থের অপবিত্রতা তাহার প্রতিটি স্তরকেই অপবিত্র করিয়া দেয়। কাজেই অর্থের পবিত্রতা ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।)×

(৫) যাহারা সংযম অভ্যাস করিয়া কাম-রিপুকে দমন করিয়া রাখিয়াছে। অর্থাৎ দেহের রাজা ও জীবনীশক্তির মূলধন বীর্যের অপচয় বা অপব্যয় করে নাই। অবশ্য বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধা রমণী অথবা (এর চেয়েও অধিক আধিপত্য যাহার উপর স্থাপিত হইয়াছে ; বিবাহের ন্যায় শরীয়ত অনুমোদিত অপর সূত্র—) স্বত্ব সূত্রে অর্জিত রমণীর গর্ভে মানব বীজ বপনোদ্দেশ্যে যদি বীর্য ব্যয় করে তবে তাহা দূষণীয় নহে। এতদ্ব্যতীত যাহারা অন্য কোনও গর্হিত উপায়ে (হস্ত মৈথুন, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বেগানা স্ত্রী দর্শন, স্পর্শন বা ব্যবহার ইত্যাদি দ্বারা) বীর্য ব্যয় করিবে ও কাম-রিপু চরিতার্থ করিবে তাহারা নিশ্চয়ই ব্যভিচারী সাব্যস্ত হইবে।

(৬, ৭) যাহারা নিজেদের নিকট গচ্ছিত আমানতের এবং নিজেদের ওয়াদা অঙ্গীকারের পুরাপুরি রক্ষণাবেক্ষণ করিয়াছে। আমানতের অর্থ—দায়িত্ব গ্রহণ করা। দায়িত্ব অনেক প্রকারের আছে—যথা আল্লার আমানত+, সামাজিক আমানত, রাষ্ট্রীয় আমানত, চাকরী ও পদের আমানত, ব্যক্তিগতভাবে গচ্ছিত টাকা-পয়সা, জমি-জমা বা গোপনীয় কথার আমানত ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অঙ্গীকার এবং শপথও অনেক প্রকারের—আল্লাহ তায়ালার নিকট শপথ, সমাজের নিকট শপথ, রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনের পশথ, ব্যক্তিগত ওয়াদা রক্ষার শপথ ইত্যাদি।

× এক হাদীছে বর্ণিত আছে—কোন কোন ব্যক্তি অসহায় আশ্রয়হীন ও বিপদগ্রস্ত হইয়া আল্লাহকে ডাকিতে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাহার ডাক শোনেন না, কারণ তাহার পানাহারের বস্তু ও পরিধেয় বস্ত্র ইত্যাদি প্রত্যকটিই হারাম এবং অসদুপায়ে অর্জিত।

+ আল্লার আমানতের অর্থ:—আল্লার আদেশ ও নিষেধাবলী অনুযায়ী স্বীয় জীবনকে গঠিত ও পরিচালিতি করার গুরুদায়িত্ব ভার গ্রহণ করা। এই গুরুদায়িত্বকেই কোরআন শরীফের ২২শে পারা ৫ম রুকুতে আল্লাহ তায়ালা আমানত বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—আমি আসমান, জমিন ও পর্বতমালাকে আমার আমানত বা বিশেষ একটি গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রতি আহ্বান জানাইলে উহারা সকলেই ভয়ে ভীত হইয়া নিজ নিজ অক্ষমতা প্রকাশ করিল, কিন্তু মানব জাতিকে সেই আহ্বান জানান হইলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়া নিল।

(৮) যাহারা আজীবন নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান রহিয়াছে।

অর্থাৎ কখনও সে সাধনায় ক্ষান্ত হয় নাই—স্থান, কাল, পাত্র নির্বিশেষে কোনও বাধা বিপত্তি লক্ষ্য না করিয়া চিরজীবন একনিষ্ঠ সাধনা করিয়াই গিয়াছে।

যাহারা এই গুণগুলি অর্জন করিতে পারিয়াছে, তাহারাই হইবে ফেরদৌস বেহেশতের অধিকারী, তাহারা তথায় অমর জীবন লাভ করিয়া অনন্তকাল অফুরন্ত সুখ-শান্তি ভোগ করিবে।

৮। হাদীছঃ— عن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اَلْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَسِتُّوْنَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ

অর্থঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঈমানের শাখা-প্রশাখা ষাট হইতে অধিক এবং লজ্জা শরম ঈমানের অন্যতম শাখা।

ব্যাখ্যাঃ—অন্য এক হাদীছে ঈমানের শাখা-প্রশাখা সত্তর হইতেও অধিক বলিয়া উল্লেখিত আছে। কোন কোন হাদীছে সাতাত্তরের প্রতিও ইঙ্গিত রহিয়াছে। এক হাদীছে বর্ণিত আছে - ঈমানের সর্বশ্রেষ্ঠ শাখা হইল ইহা স্বীকার করা যে—আল্লাহ ভিন্ন অন্য কোনও মা'বুদ নাই। সর্বাপেক্ষা ছোট শাখা—কষ্টদায়ক বস্তুকে চলাচলের পথ হইতে অপসারিত করা।

লজ্জা-শরমকে ঈমানের একটি বিশেষ শাখা বলা হইয়াছে। কারণ, ঈমান যেমন মানুষকে কুকর্ম হইতে নিবৃত্ত করে, তদ্রূপ লজ্জা-শরমও মানুষকে অনেক কুকর্ম হইতে বিরত রাখে।

লজ্জা-শরম মানব চরিত্রের একটি বিশিষ্ট গুণ। দুর্বলতা ও পবিত্রতা এই দুইয়ের সংমিশ্রনে ঐ গুণটির উৎপত্তি। নিন্দিত হইবার আশঙ্কায় যে কোনও কাজ করিবার বা কথা বলিবার প্রতি মানুষের মনে যে একটা অনিচ্ছা ও সঙ্কোচভাব এবং দুর্বলতা স্বভাবতঃ উদিত হয় তাহাকেই হা'য়া বা লজ্জা-শরম বলা হয়।

প্রকার ভেদে লজ্জা-শরমও কয়েক প্রকার। যথা—ভাল কাজ করিতে বা কোনও ভাল কথা বলিতে যদি শরম বোধ হয় তবে উহা প্রকৃতপক্ষে শরম নহে, বরং উহা এক প্রকার দুর্বলতা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; এরূপ শরমকে ঈমানের শাখা বলা হয় নাই। যেমন—কোন দরকারী কথা আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিতে এই ভাবিয়া শরম বোধ হয় যে এই সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে লোকে কি মনে করিবে? বা কোনও কামেল পীরের সাহচর্য্যে থাকিতে এই মনে করিয়া লজ্জা করা যে, লোকে বলিবে, মোল্লা তাবেদার হইয়া গিয়াছে। কিম্বা কোনও গরীব অসমর্থ ব্যক্তি তাহার বোঝাটা মাথায় উঠাইয়া দিবার সাহায্য প্রার্থনা করিলে তাহাকে সাহায্য করিতে শরম বোধ হয় এই ভাবিয়া যে, লোকে কি মনে করিবে? এইগুলিকে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হয় নাই, বরং এইগুলি এক প্রকারের অহঙ্কার-সঞ্জাত হীনমন্যতা (Inferiority complex) অর্থাৎ মনের নীচতা ও দুর্বলতা মাত্র।

যে শরমকে হাদীছে ঈমানের শাখা বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে উহা এই—নির্দয়তা ও নিষ্ঠুরতামূলক কাজকরিতে বা অভদ্র ব্যবহার করিতে বা ফাহেশা ও পাপের কাজ করিতে বা প্রকাশ্যে স্বামী স্ত্রী সুলভ ব্যবহার করিতে বা পরপুরুষ পরস্ত্রীর সহিত পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ করিতে বা কথাবার্তা বলিতে ইত্যাদি এই শ্রেণীর কার্য্যে যে শরম বোধ হয়। বস্তুতঃ এই পর্য্যায়ের শরমকেই প্রকৃত প্রস্তাবে লজ্জা-শরম বলা যাইতে পারে। কারণ, এসবের মধ্যে পবিত্রতার প্রাধান্য রহিয়াছে, শুধু দুর্বলতা ও অশক্তিই নহে।

এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) একদা ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আল্লাহ তায়ালাকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা কর। ছাহাবীগণ আরজ করিলেন, আল্লার শোকর—আমরা ত আল্লাহ তায়ালাকে লজ্জা করিয়া থাকি। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তোমরা সাধারণতঃ যতটুকু লজ্জা করিয়া থাক, শুধু ঐটুকুই আমার উদ্দেশ্য নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করার দাবী রাখে, তাহার কর্তব্য—স্বীয় মাথার মধ্যে যে সমস্ত শক্তি আছে, যথা—স্মরণশক্তি, বিবেচনাশক্তি চিন্তাশক্তি ইত্যাদি) এবং মাথা সংলগ্ন ইন্দ্রিয়গুলি, যথা—চক্ষু, কর্ণ নাসিকা, জিহ্বা ইত্যাদিকে কুকর্ম ও কুপথ হইতে বিরত রাখা। পেট এবং পেট-সংলগ্ন রিপু (নফছ ও গুপ্তাঙ্গ)কে তদ্রূপ রক্ষা করা, (অর্থাৎ হারাম খাওয়া ও ব্যভিচারী হইতে বিরত থাকা।) তদুপরি তাহার আরও কর্তব্য হইবে যে, মৃত্যু তথা এই অস্তিত্বের বিলুপ্তিকে স্মরণ করতঃ আখেরাতের দিকে ধাবিত হওয়া এবং দুনিয়ার মোহ ও ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করা। যে ব্যক্তি এ মমস্ত কাজ পুরাপুরি সাধন করিবে, সে-ই আল্লাহকে পূর্ণ মাত্রায় লজ্জা করে বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। (তিরমিজী শরীফ)

একজন মহামনীষী লজ্জার ব্যাখ্যা এই করিয়াছেন—তোমার সর্বস্বের মালিক (আল্লাহ তায়ালা) যেন তোমাকে এমন জায়গায় বা এমন কাজে দেখিতে না পান, যেখানে যাইতে বা যাহা করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন—ইহাই প্রকৃত লজ্জা।

এই সমস্ত বিবরণ অনুযায়ী স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃত লজ্জা শরম কাহারও হাসিল হইলে সে শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হইতে পারে। এই সূত্রেই 'হায়া' বা লজ্জা শরমকে ঈমানের একটি অন্যতম বিশিষ্ট শাখা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মোসলমান কে?

৯। হাদীছঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ۔

অর্থঃ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—মোসলমান ঐ ব্যক্তি যাহার কোনও কথা বা কার্য্যের দ্বারা অন্য

মোসলমানদের কষ্ট না ঘটে। মোহাজের ঐ ব্যক্তি যে আল্লার নিষিদ্ধ বিষয়সমূহকে পরিত্যাগ ও বর্জন করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ঃ—"মোসলেম" শব্দের মধ্যে শান্তির অর্থ নিহিত রহিয়াছে; সুতরাং যাহার দ্বারা অন্যের অশান্তি ঘটে, তাহাকে মোসলেম বলা যাইতে পারে না। তদ্রূপ মোহাজের অর্থ "ত্যাগী"। যে আল্লার নিষিদ্ধ বস্তুকে পরিত্যাগ না করিবে, তাহাকেও ত্যাগী বলা যাইতে পারে না। অন্য এক হাদীছে আছে—"মোমেন ঐ ব্যক্তি যাহার প্রতি প্রত্যেকটি মানুষের আস্থা থাকে এবং তাহার তরফ হইতে সমস্ত লোক নির্ভয়ে ও নিরাপদে থাকিতে পারে।" "মোমেন" শব্দের মধ্যে নিরাপত্তা ও আস্থাভাজন হওয়ার অর্থ নিহিত আছে; সুতরাং যাহার প্রতি আস্থা স্থাপন করা না যায় ও যাহার তরফ হইতে মানুষ নির্ভয়ে নিরাপদে থাকিতে না পারে, তাহাকে "মোমেন" বলা যাইতে পারে না। অর্থাৎ মোসলেম বা মোমেন শব্দের দাবীদারদের মধ্যে চরিত্রগুণ উল্লিখিত পরিমাণে থাকা চাই, নতুবা সে ঐ নামের উপযুক্ত নহে।

লক্ষ্য করুন—ইসলাম কত বড় মহান ধর্ম যে, উহার নির্দ্ধারিত প্রতিটি নামবাচক শব্দের মধ্যেও শান্তি, শৃঙ্খলা, সততা এবং সংযম ইত্যাদি গুণের মহান আদর্শ সমূহের ইঙ্গিত রহিয়াছে।

ইসলামের উত্তম স্বভাব কি?

১০। হাদীছ ঃ—ছাহাবী আবু মুছা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—ছাহাবীগণ রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন্ ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট মোসলমান? হযরত (দঃ) বলিলেন, যাহার কোনও কথা বা কার্য্য দ্বারা অন্য মোসলমানের কোন কষ্ট না হয়।

ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ অন্ন দান ঃ

১১। হাদীছ ঃ— عن عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه

أَنَّ رَجُلاً سَئَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ قَالَ تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَءُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَّمْ تَعْرِفْ -

অর্থাৎ—আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, ইসলামের বিশিষ্ট ভাল কাজ কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, অন্ন দান করা এবং পরিচিত অপরিচিত নির্বিশেষে সকলকে সালাম করা।

ব্যাখ্যা ঃ—সালামের উদ্দেশ্য শুধু মুখে "আসসালামু আলাইকুম" বলাই নহে, মুখে বলার সঙ্গে কার্য্য ও চরিত্রের দ্বারা উহার অর্থকেও প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—পরিচিত অপরিচিত সকলকেই শান্তি, নিরাপত্তা ও আশীর্বাদ প্রদান করিতে হইবে।

এই হাদীছের মধ্যে অন্যত্র আরও তিনটি গুণের উল্লেখ আছে, যথা—মিষ্টভাষী হওয়া কর্কশভাষী না হওয়া, স্বীয় আত্মীয় ও জ্ঞাতিগোষ্ঠীর সহিত সদ্ব্যবহার করা এবং গভীর রাত্রে যখন অন্য সকলে নিদ্রামগ্ন থাকে তখন আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিদ্রা ত্যাগ করতঃ নামায পড়া।

ঈমানের একটি বিশেষ শাখা

১২। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারে না যাবৎ না সে অন্য মোসলমান ভাই-এর জন্য ঠিক সেইরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহারপ ছন্দ করে, যেরূপ ব্যবস্থা ও ব্যবহার সে নিজের জন্য পছন্দ করিয়া থাকে।

ব্যাখ্যা ঃ—অন্য একটি হাদীছের দ্বারা এই হাদীছটির তাৎপর্য্য আরও স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। এক ব্যক্তি রসুলুল্লাহ (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিল, আমি ইসলাম গ্রহণ করিতে চাই, কিন্তু আমি জেনা (ব্যভিচার) হইতে বিরত থাকিতে অক্ষম। রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাকে স্নেহভরে ডাকিয়া নিকটে বসাইলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, তুমি কি ইহা পছন্দ কর যে, তোমার মা বোন বা মেয়ের সঙ্গে অপর কেহ জেনা করে? সে রক্তাক্ত চোখে উত্তর করিল—ইহা কার্য্যে পরিণত করা ত দূরের কথা কেহ এরূপ ইচ্ছা পোষণ করা মাত্রই আমি তাহাকে তরবারির আঘাতে দুই টুকরা করিয়া ফেলিব। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, তাহা হইলে তুমি যে মহিলার সঙ্গে জেনা করিবে সেও ত কাহারও মা, বোন বা মেয়ে হইবে!

কি সুন্দর শিক্ষা ও কত যুক্তিপূর্ণ উপদেশ। এর সুফল কত ব্যাপক। এই আদর্শের ভিত্তিতে সকল প্রকার ঝগড়া, বিবাদ, দ্বেষ, হিংসা, শত্রুতা, খেয়ানত, ধোকাবাজী, কাহারও অনিষ্ট করা ইত্যাদি এমনকি চুরি, ডাকাতি সকল প্রকার ব্যভিচারের অবসান হইতে পারে।

রসুলুল্লার (দঃ) মহব্বৎ ঈমানের মূল

১৩। হাদীছ ঃ—আবু হোরায়রা (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, ঐ খোদার কসম যাঁহার হাতে আমার জান—তোমাদের কেহ মোমেন গণ্য হইবে না যাবৎ না আমার প্রতি তাহার মহব্বৎ ও ভালবাসা তাহার মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি অপেক্ষা অধিক হয়!

১৪। হাদীছ ঃ— عن انس رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, যাঁহার হাতে আমার জীবন তাঁহার অর্থাৎ আল্লার শপথ করিয়া বলিতেছি—কোন ব্যক্তি মোমেন হইতে পারিবে না, যাবৎ না তাহার মাতা-পিতা, ছেলে-মেয়ে এবং জগতের সমস্ত লোক অপেক্ষা অধিক মহব্বৎ ও ভালবাসা আমার সঙ্গে রাখিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এক হাদীছে বর্ণিত আছে, একদা ওমর (রাঃ) হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন—আপনার প্রতি আমার মহব্বৎ সকলের চাইতে বেশী আছে, কিন্তু নিজের জীবন হইতে বেশী মনে হয় না। রসুলুল্লাহ (দঃ) শপথ করিয়া বলিলেন, তা হইবে না; নিজের জীবন হইতেও অধিক মহব্বৎ আমার প্রতি রাখিতে হইবে। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া ওমর (রাঃ) বলিলেন, এখন স্বীয় জীবন হইতেও অধিক মহব্বৎ আপনার সঙ্গে আমার হাসিল হইয়াছে। হযরত (দঃ) বলিলেন, এখন আপনি মোমেন হইতে পারিয়াছেন।

রসুলুল্লাহ (দঃ) তাঁহার নিজের প্রতি অধিক মহব্বতের আদেশ স্বীয় কোনও স্বার্থের জন্য করেন নাই; বরং মানবের কল্যাণের জন্যই এই আদেশ করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা রসুল (দঃ)কে স্বীয় সন্তুষ্টি ও পছন্দের নমুনা বানাইয়া পাঠাইয়াছেন। তাই রসুল (দঃ)-এর অনুসরণের উপরই মানব জাতির কল্যাণ ও নাজাত নির্ভর করে। পরন্তু, পূর্ণ অনুসরণ মহব্বৎ ও ভালবাসা ব্যতিরেকে হয় না।

এখন মহব্বতের অর্থ রসুল হিসাবে ভক্তি ও ভালবাসা; তাহাও শুধু মৌখিক ও ভাবাবেগের বা আত্মীয়তার মহব্বৎ উদ্দেশ্য নয়। বরং রসুল হিসাবে এরূপ গভীর মহব্বৎ যাহার দরুন রসুলুল্লার (দঃ) অনুসরণ ও আনুগত্যের প্রতি পূর্ণ আকর্ষণ জন্মে। কোন প্রকার স্বার্থ, মোহ, ভয় বা কষ্টই তাঁহার অনুসরণ ও আনুগত্য হইতে নিবৃত্ত করিতে সক্ষম না হয়। সাধারণ ভালবাসা বিভিন্ন কারণে অনেক কাফেরের মধ্যেও দেখা যায়, যেমন—রসুলুল্লার (দঃ) চাচা আবু তালেব রসুলুল্লাহ (দঃ)কে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতেন। কিন্তু আবু তালেবের সেই ভালবাসা কেবলমাত্র স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র বা নিজ গোষ্ঠির ভাল ছেলে হিসাবে ছিল, আল্লার রসুল হিসাবে নহে।

ঈমানের স্বাদ লাভ করার উপায়

১৫। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

ثَلٰثٌ مَّنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهٗ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ-

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—এমন তিনটি গুণ আছে যে, কাহারও ভিতরে ঐ তিনটি গুণের সমাবেশ হইলে সে ঈমানের মাধুর্য্য ও সুস্বাদ অনুভব করিতে পারিবে। (১) আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মহব্বৎ হওয়া, অর্থাৎ পার্থিব আকর্ষণ অপেক্ষা আল্লাহ ও রসুলের (দঃ) প্রতি সর্বাধিক মনের টান ও প্রাণের আকর্ষণ হওয়া। (২) কাহাকেও ভালবাসিলে তাহা একমাত্র আল্লার উদ্দেশ্যেই হওয়া। অর্থাৎ আল্লার প্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যে ভালবাসা এবং আল্লার অপ্রিয় ব্যক্তি বা বস্তুকে শুধু আল্লার উদ্দেশ্যেই অপ্রিয় গণ্য করা; কাহারও সহিত কাম-ভাবের বশে বা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভালবাসা না করা। (৩) ইসলাম ও ঈমানের প্রতি এত গাঢ় অনুরক্ত হওয়া যে, ইসলাম হইতে বঞ্চিত হইয়া কুফুরির দিকে যাওয়াকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়া তুল্য অপছন্দনীয় গণ্য করা।

ঈমানের একটি বিশেষ নিদর্শন

১৬। হাদীছ ঃ— عن انس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال

اٰيَةُ الْاِيْمَانِ حُبُّ الْاَنْصَارِ وَاٰيَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الْاَنْصَارِ-

অর্থ ঃ—আনাছ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—আনছারদের (মদীনাবাসী ছাহাবীদের) সঙ্গে মহব্বৎ রাখা ঈমানের আলামত ও নিদর্শন। তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা মোনাফেকীর পরিচায়ক।

ব্যাখ্যা ঃ—মদীনাবাসী ছাহাবীগণ দ্বীন-ইসলামের একনিষ্ঠ খাদেম ছিলেন; এই কারণেই তাঁহাদিগকে "আনসার"—দ্বীনের সহায্যকারী উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই হিসাবে যদি কেহ তাঁহাদের প্রতি শত্রুতা পোষণ করে তবে সে নিশ্চয় মোনাফেক হইবে। আর মিত্রভাব পোষণ করিলে নিশ্চয় উহা তাহার ইসলামের প্রতি অনুরাগের নিদর্শন হইবে।

ইসলামী জীবনের শপথ ও অঙ্গীকার

১৭। হাদীছ ঃ—ওবাদা ইবনে ছামেত (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে আলাইহে অসাল্লাম তাঁহার ছাহাবীগণের মধ্যে উপবিষ্টাবস্থায় তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তোমরা আমার নিকট শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ কর এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ হও যে, আল্লার সহিত কোনও বস্তুকে শরীক করিবে না, চুরি করিবে না, জেনা (ব্যভিচার) করিবে না, আপন সন্তানকে হত্যা করিবে না*, কাহারও উপর মিথ্যা

---

* ইসলাম-পূর্ব যুগে আদিম বর্বর আরববাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে, মেয়ে সন্তান হওয়াকে তাহারা অপমান মনে করিত; এমনকি কোনও নিষ্ঠুরাত্মা পিতা স্বীয় কন্যা সন্তান জীবিতাবস্থায়ই মাটি চাপা দিয়া দিত। কেহ কেহ আবার অধিক খরচে পড়িয়া অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ছেলে মেয়ে উভয় শিশু সন্তান মারিয়া ফেলিত। এই সকল অমানুষিক নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার মূলে ইসলাম কুঠারাঘাত হানিয়াছে—এই সবের বিরুদ্ধে কোরআন শরীফের একাধিক আয়াত নাযেল হইয়াছে; রসুলুল্লাহ (দঃ)ও ঐরূপ কুসংস্কার হইতে বিরত থাকার অঙ্গীকার লইয়াছেন।

দোষারোপ করিবে না—ভিত্তিহীন অপবাদ ও অভিযোগ আনিবে না এবং আমার (তথা শাসন কর্তৃপক্ষের) বিরুদ্ধাচরণ করিবে না—ঐ সব বিষয়ে যাহা আল্লার বিধান বিরোধী না হয়। (রসুল (দঃ) আরও বলিলেন—)

যে ব্যক্তি এই সব অঙ্গীকার অনুযায়ী চলিবে, নিশ্চয়ই সে আল্লার নিকট তাহার সুফল ও পুরস্কার পাইবে। পরন্তু, যদি কেহ কোনও নিষিদ্ধ কাজ করিয়া ফেলে এবং শরীয়তের হুকুম অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাস্তি তাহার উপর প্রয়োগ করা হয়, তবে সেই শাস্তি (গ্রহণে কুণ্ঠা বোধ করিবে না। কারণ, ঐ শাস্তি) তাহার গোনাহের কাফ্ফারা হইবে, কিন্তু যদি তাহার ঐ কাজ জনসমাজে প্রকাশ না হওয়ায় শরীয়তের বিধানগত জাগতিক শাস্তিভোগ হইতে সে রক্ষা পাইয়া থাকে, তবে গোনাহের বিচারের ভার আল্লার উপর ন্যস্ত থাকিবে, আখেরাতে তাহাকে শাস্তিও দিতে পারেন মাফও করিতে পারেন। সেমতে ছাহাবীগণ এই শপথ বা দীক্ষা গ্রহণ করতঃ অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন।

দ্বীন রক্ষার্থে সর্বস্ব ত্যাগ করা বড় ধর্ম

১৮। হাদীছঃ— عن ابى سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يُوشِكُ اَنْ يَّكُوْنَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَّتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهٖ مِنَ الْفِتَنِ -

অর্থঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, সেই দিন অতি নিকটবর্তী—যখন একজন মোসলমানের জন্য উত্তম সম্পদ হইবে মাত্র কয়েকটি বকরী, যেগুলিকে লইয়া সে পাহাড়-পর্বতের চূড়ায়—যেখানে বৃষ্টির পানিতে ঘাস-পাতা জন্মায় এমন স্থান অনুসন্ধান করিয়া সেখানেই বসবাস করিবে। (সমস্ত জগৎ তখন ফেৎনা-ফাসাদে পরিপূর্ণ হইবে, তাই) সে স্বীয় দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য লোকালয় হইতে সরিয়া পড়িবে।

ব্যাখ্যাঃ—উল্লিখিত হাদীছের মূল উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক মোসলমানের কর্তব্য হইল দ্বীন ও ধর্মকে সর্বাগ্রে ও সকলের উর্দ্ধে স্থান দেওয়া। যখন চতুর্দিকের ফেৎনা-ফাসাদের দ্বারা স্বীয় দ্বীন আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা হইবে তখন দ্বীনকে রক্ষা করার জন্য ধন-জন, বাড়ী-ঘর, বিষয়-সম্পত্তি সব কিছু পরিত্যাগ করতঃ পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গলে নির্বাসিত জীবন যাপনেও কুণ্ঠিত হওয়ার জন্য সকল মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করা হইয়াছে ও প্রেরণা দেওয়া হইয়াছে।

আল্লার মা'রেফাত অনুপাতে তাঁহার প্রতি ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে

'আল্লার মা'রেফাত'-এর অর্থ—আল্লাকে চেনা ও আল্লার তত্ত্ব জ্ঞান হাসিল করা। ইহা মানুষের ইচ্ছাধীন ও আয়ত্তাধীন ক্রিয়াবিশেষ। অবশ্য বাহ্যিক অঙ্গের ক্রিয়া নহে, বরং ইহা অন্তরের ঐকান্তিক সাধনার প্রক্রিয়া। সুতরাং উহা নিজে নিজেই উৎপত্তি হয়

না, বরং প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অক্লান্ত অধ্যবসায়ের মাধ্যমে উহা অর্জন করিতে হয়। প্রথমতঃ দেলের ময়লা সমূহ (হীন স্বার্থ-চিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য, নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা ইত্যাদি)কে দুর করিতে হইবে। এই সকল আবিলতা ও কলুষতা হইতে মুক্ত হইয়া দেল যখন আয়নার মত পরিস্কার ও স্বচ্ছ হয় এবং তদবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করতঃ আল্লার ধ্যানে মগ্ন হওয়া যায়, তখন দেলের মধ্যে আল্লার মহৎ গুণাবলী প্রতিবিম্বিত ও বিকশিত হইয়া থাকে। আল্লার ঐ মহৎ গুণাবলীকে দেলের মধ্যে ধরিয়া ও ভরিয়া রাখা এবং হৃদয়পটে অঙ্কিত করিয়া রাখার নামই "মা'রেফাত"। আল্লার এই মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান হাসিল করাই মানব জীবনের চরম কাম্য বস্তু। ইহা হাসিল করা মানুষের ক্ষমতা ও আয়ত্তের নয়, ইচ্ছা করিলে সাধনা করিয়া হাসিল করিতে পারে। কারণ, মানুষের বাহ্যিক অঙ্গের প্রক্রিয়াগুলি যেমন তাহার ইচ্ছাধীন; তাহার আভ্যন্তরীণ অঙ্গের সৎ বা অসৎ ক্রিয়াগুলিও তেমনি তাহার ইচ্ছা ও ক্ষমতার বহির্ভূত নহে+। তাই মানুষের চেষ্টা ও সাধনার তারমধ্যে আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান কম বা বেশীরূপে হাসিল হইয়া থাকে। এবং এই মা'রেফাত লাভের তারতম্য অনুপাতেই মানুষের ভিতরে আল্লার ভয়ের সঞ্চার হয়। নিম্ন বর্ণিত হাদীছটিতে রসুলুল্লাহ (দঃ) এই তথ্যটিই স্বীয় অবস্থার দ্বারা সম্যক ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৯। **হাদীছ ঃ**— আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অলাল্লাম ছাহাবীদিগকে কোন আমলের আদেশ করিতে এমন আমলের আদেশ করিতেন যাহা সর্বদা সহজে করিয়া যাওয়া সম্ভব হয়। সে জন্য তিনি যথাসম্ভব অল্প ও সহজ আমলের শিক্ষা দিতেন। ছাহাবীগণ নেক কাজের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহশীল ছিলেন; তাঁহারা বেশী বেশী ও কঠিন কঠিন এবাদৎ ও সাধনা নিজেদের উপর টানিয়া লইবার চেষ্টায় থাকিতেন এবং মনে মনে এরূপ ভাব পোষণ করিতেন যে, হযরত রসুলুল্লাহ (দঃ) নিষ্পাপ, তাঁহার মর্তবা অতি উর্দ্ধে; সেই জন্য এবাদতের প্রয়োজন তাঁহার নাই। এই ভাবিয়া) তাঁহারা কোন কোন সময় বলিয়া ফেলিতেন—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আমরা ত আপনার মত নই; আপনি সম্পূর্ণ নিষ্পাপ—পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ-ই আপনার জন্য মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। (তাই আপনার ন্যায় আমাদের কম এবাদৎ করিলে চলিবে কেন? এরূপ উক্তিকে রসুলুল্লাহ (দঃ) অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া উঠিতেন; তাঁহার চেহারা মোবারকের উপর রাগের নিদর্শন প্রকাশ পাইত। তারপর ঐ ভুল ধারণা নিরসনে বলিতেন, নিশ্চয় জানিও—আল্লাকে আমি সবচেয়ে বেশী ভয় করিয়া থাকি। কারণ, আল্লার মা'রেফাত ও তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী আছে আমার।

+ এই জন্যই আল্লাহ তায়ালা কোরআনে ঘোষণা করিয়াছেন—ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم অর্থাৎ—তোমাদের অন্তকরণ ইচ্ছাকৃতভাবে যে সকল ক্রিয়া সমাধা করিবে তজ্জন্য আল্লাহ তোমাদিগকে দায়ী করিবেন, যদি অন্তরের ক্রিয়াকলাপ মানুষের আয়ত্তাধীন না হইত, তবে উহার দরুণ সে দায়ী হইত না।

ব্যাখ্যা ঃ—ইহা দ্বারা রসুলুল্লাহ (দঃ) এরূপ বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, তোমরা হয়ত মনে করিয়াছ—আমার মর্তবা বড় সে জন্য আমি খোদাকে ভয় কম করিব, তাঁহার এবাদৎ বন্দেগী কম করিব, শুইয়া শুইয়া আরামে জীবন যাপন করিব। না, না—তাহা কখনই নহে। আল্লাহ যেমন মর্তবা বড় করিয়াছেন, আমাকে তাঁহার মা'রেফাত এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সকলের চেয়ে বেশী দান করিয়াছেন। সেই অনুপাতে আমি আল্লাহ তায়ালাকে ভয়ও সকলের চেয়ে বেশী করিয়া থাকি। তবে আমি তোমাদের এবং সমগ্র মানব জাতির জন্য এমন নীতি, এমন ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে চাই, যাহা সকলে সর্ব সময় অনায়াসে করিতে পারে।

রসুলুল্লাহ (দঃ) ব্যক্তিগতভাবে অনেক বেশী এবাদৎ করিতেন, যেমন এক হাদীছে আছে—রসুলুল্লাহ (দঃ) তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে তাঁহার পদদ্বয় ফুলিয়া যাইত, কোন কোন সময় পা ফাটিয়াও যাইত। এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি ত নিষ্পাপ, আপনি কি জন্য এত কষ্ট করেন? রসুলুল্লাহ (দঃ) উত্তর করিলেন—"যে আল্লাহ আমাকে নিষ্পাপ করিয়াছেন, আমি কি তজ্জন্য তাঁহার শোকর আদায় করিব না?"

পাঠকবৃন্দ! উল্লিখিত হাদীছের তাৎপর্য্য অনুযায়ী প্রমাণিত হয় যে—আল্লার মা'রেফাত যাহার মধ্যে যত বেশী হইবে আল্লার ভয়ও তাহার মধ্যে তদনুপাতে বেশী হইবে। অধুনা অনেকেই মা'রেফাত দাবী করিয়া থাকে বটে কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লার ভয়, আল্লার এবাদৎ বন্দেগী, সাধনা আরাধনা ইত্যাদিতে তাহাদিগকে সেরূপ অগ্রণী দেখা যায় না। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ভুয়া দাবীদারদিগকে ধোকাবাজ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে।

ঈমানের প্রতি কিরূপ অনুরাগ আবশ্যক

ইমাম বোখারী (রঃ) ১৫নং হাদীছ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন মোসলমানকে ঈমানের প্রতি এরূপ আসক্ত ও দৃঢ় অনুরাগী হইতে হইবে যাহার ফলে ঈমানের বিপরীত তথা কুফরের প্রতি তাহার ক্ষোভ, উৎকণ্ঠা, অসন্তোষ এবং ভীতি ও ত্রাস ঐরূপ অধিক পরিমাণে সৃষ্টি হয় যেরূপ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রতি রহিয়াছে। এই অবস্থাটা মূল ঈমানের বিশেষ অঙ্গ; যাহার মধ্যে এই অবস্থা নাই তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ এবং এই অবস্থার পরিমাণ অনুপাতেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ হইবে। ঐ অবস্থা ব্যতিরেকে ঈমান অত্যন্ত ক্ষীণ ও মৃতবত।

ঈমানের পরিমাণ কম-বেশী হওয়ার প্রমাণ

২০। **হাদীছ** ঃ—আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, বেহেশতীগণ বেহেশতে এবং দোযখীরা দোযখে যাওয়ার পর আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাগণকে আদেশ করিবেন—যাহাদের অন্তরে অন্ততঃ সরীষা-বীজ

পরিমাণ ঈমান আছে তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া আন। ফেরেশতাগণ তাহাদিগকে এমন অবস্থায় দোযখ হইতে বাহির করিয়া আনিবেন যে, তাহারা অনবরত আগুনে পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গিয়াছে। তখন তাহাদিগকে আবে-হায়াতের (জীবনী-শক্তির) নদীতে ফেলা হইবে। সেখান হইতে তাহারা নূতন জীবন লাভ করতঃ অতিশয় সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া উঠিবে।

ব্যাখ্যা ঃ—এই হাদীছের দ্বারা ঈমান একটি পরিমাণ-বিশিষ্ট বস্তু হওয়া সাব্যস্ত হয় এবং উহার পরিমাণে কম বেশী হওয়াও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। অন্য এক হাদীছে ঈমানের কম-বেশী হওয়া সম্বন্ধে আরও বিস্তারিত বর্ণনা রহিয়াছে যে—আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদিগকে বলিবেন, দোযখবাসীদের মধ্যে যাহাদের অন্তরে এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পরিমিত ঈমানের অস্তিত্ব দেখিতে পাও তাহাদিগকে দোযখ হইতে বাহির করিয়া লইয়া আইস। দ্বিতীয়বার বলিবেন, যাহাদের অন্তরে অর্দ্ধ দীনার পরিমিত ঈমান খুঁজিয়া পাও, তাহাদিগকেও বাহির করিয়া আন। তৃতীয়বার বলিবেন, যাহার অন্তরে অণু পরিমাণ ঈমানের অস্তিত্বও পাও, তাহাকেও বাহির করিয়া লও। তারপরেও এমন এক শ্রেণীর লোক অবশিষ্ট থাকিয়া যাইবে যাহাদের অন্তরে অণু হইতেও সূক্ষ্মতর ঈমানের অস্তিত্ব থাকিবে। তাহাদের সেই ঈমান এতদূর সূক্ষ্ম হইবে যে, উহার অস্তিত্ব নবী ও ফেরেশতাগণের অনুভূতির আওতায় আসিবে না; তাহাদিগকে স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা দোযখ হইতে বাহির করিবেন।

লজ্জা-শরম ঈমানের শাখা

২১। হাদীছ ঃ—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম জনৈক আনছারী ব্যক্তির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন। ঐ ব্যক্তি তাহার ভ্রাতাকে লজ্জা-শরমের ব্যাপারে নছিহত ও ভৎর্সনা করিতেছিল (যে, তুমি লজ্জা কর কেন?) রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন, তাহাকে এ বিষয়ে রাগ করিও না; (লজ্জা শরম ভাল জিনিষ) যেহেতু লজ্জা-শরম ঈমানের একটি শাখা।

ব্যাখ্যা ঃ—লজ্জা-শরম এক জিনিষ এবং হীনমন্যতা বা আত্মাভিমান প্রসূত মনের নীচতা ও দুর্বলতা (Inferiority complex) ভিন্ন জিনিষ। এ বিষয়ে ৮ নং হাদীছের ব্যাখ্যায় বিস্তারিত বিবরণ রহিয়াছে। লজ্জা-শরমের বিষয়ে কাহাকেও রাগ বা তিরস্কার করা চাই না; যেমন এই হাদীছে বর্ণিত হইল। কিন্তু মনের নীচতা ও দুর্বলতা পরিহার করার শিক্ষা দিবে।

ইসলামের স্বীকারোক্তি এবং নামায ও যাকাৎ আদায় করিলে তাহাকে মোসলমান গণ্য করা হইবে

অর্থাৎ কোনও ব্যক্তির পক্ষে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যাপারে মোসলমান গণ্য হইবার জন্য এবং মোসলমান হিসাবে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা, অধিকার ও দাবীদাওয়ার যোগ্যতা

লাভ করিবার জন্য তাহার মধ্যে দুইটি বিষয় প্রাপ্ত হওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ তাহার কোন কার্য্য বা কথা ইসলামের স্বীকারোক্তির কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটায়। দ্বিতীয়তঃ সঠিকভাবে নামায ও যাকাৎ আদায় করার ব্যাপারে সে ত্রুটিহীন হয়। এই দুইটি বস্তুর অস্তিত্ব কাহারও মধ্যে পাওয়া গেলে তাহাকে মোসলমান দলভুক্তরূপে মানিয়া লইতে হইবে। এবং রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পর্য্যায়ের সুযোগ-সুবিধা ও অধিকারাদি দানের ব্যাপারে তাহার আন্তরিকতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার প্রয়োজন হইবে না; সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দেওয়ার জন্য সে আল্লার নিকট দায়ী থাকিবে। অবশ্য যদি কোনও ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে, তবে তাহাকে পার্থিব শাস্তি বিধানও করা হইবে। ইসলামী সংবিধানের উল্লিখিত ধারাটি কোরআন ও হাদীছ উভয়ের দ্বারা প্রমাণিত।

কোরআনের আয়াত—

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَآتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ

অর্থ:—অতঃপর (হে মোসলমানগণ! তোমাদিগকে আদেশ করা যাইতেছে—) যদি তাহারা (কাফেরগণ) ইসলামদ্রোহিতা—কুফর* এবং শের্‌ক বর্জনপূর্বক (খাঁটী তৌহিদের দিকে অর্থাৎ এক আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার প্রেরিত পয়গাম্বরকে বিশ্বাস ও স্বীকার করিয়া লওয়ার দিকে) প্রত্যাবর্তন করে এবং নামায কায়েম করে ও যাকাৎ আদায় করে, তবে তাহাদিগকে মুক্ত পরিবেশের সুযোগ দান কর—তাহাদের জান-মালের নিরাপত্তা দান কর। (১০ পাঃ ৭ রুঃ)

২২। হাদীছ:— عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتّٰى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّٰهِ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ -

অর্থ:—আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন আল্লার তরফ হইতে আমি আদিষ্ট হইয়াছি, আমি যেন বিপথগামী জগদ্বাসীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া যাই—জেহাদ করিয়া যাই যে পর্য্যন্ত না তাহারা এই স্বীকারোক্তি করিবে যে, এক আল্লাহই মাবুদ ও উপাস্য; তিনি ভিন্ন অন্য কোনও মাবুদ

* 'কুফর' অর্থ আল্লাহকে, আল্লার বাণীকে, আল্লার রসুলকে স্বীকার ও গ্রহণ করার মতবাদ উপেক্ষা করা। 'শের্‌ক' অর্থ আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে মাবুদরূপে অন্য কাউকে কিম্বা আল্লাহ বিরোধী বস্তু ও মতবাদকে স্বীকার করিয়া চলা—উভয়টিই তৌহিদ বিরোধী।

বা উপাস্য নাই এবং মোহাম্মদ (দঃ) আল্লার সাচ্চা রসুল এবং নামায কায়েম করিবে ও যাকাৎ দান করিবে। যাহারা এই কয়টি কাজ পূর্ণ করিবে তাহারা (মোসলমান হিসাবে) জান মাল রক্ষার অধিকার পাইবে। অবশ্য ইসলামের বিধান লঙ্ঘনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে। (আর উল্লেখিত বাহ্যিক কার্য্যাবলীর দ্বারা শুধুমাত্র পার্থিব আত্মরক্ষার অধিকার পাইবে।) আন্তরিক অবস্থার জন্য (অন্তর্যামী) আল্লাহ তায়ালার নিকট দায়ী থাকিবে। (তদনুসারেই পরকালে আল্লাহ তায়ালার দরবারে তাহার হিসাব-নিকাশ হইবে।)

ব্যাখ্যা ঃ— যে ব্যক্তি মোসলমান দলভুক্ত গণ্য হইবে সে জান-মালের নিরাপত্তার অধিকারী হইবে, কিন্তু ইসলামী আইনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থাসমূহ যাহা শরীয়তে বিধিবদ্ধ আছে উহা তাহার উপর অবশ্যই প্রবর্তিত হইবে। যেমন—চুরি করিলে হাত কাটা যাইবে, জেনা করিলে 'ছঙ্গ-ছার' (প্রস্তরাঘাতে প্রাণ নাশ) করা হইবে, খুনের বদলে খুন করা হইবে, ধর্মীয় কর্তব্য ও অনুষ্ঠান সমূহ পালন না করিলে তজ্জন্য নির্দিষ্ট শাস্তি প্রদান করা হইবে ইত্যাদি।

স্মরণ রাখিবে প্রকাশ্যে মোসলমান দলভুক্তি ইহকালের জন্য রক্ষাকবচ বটে, কিন্তু অন্তরে কুটিলতা রাখিয়া বাহ্যিক দলভুক্তির দ্বারা কেহ কখনও মোমেন হইতে পারিবে না এবং পরকালে নাজাত ও মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না; বরং মোনাফেকের অধিক আজাব হইবে। আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন—"মোনাফেকগণ দোযখের সর্বনিম্ন তলায় থাকিবে।" (৫ পারা শেষ রুকু দ্রষ্টব্য)

ঈমান একটি (ইচ্ছাকৃত ও উপার্জিত) প্রধান আমল

উপরোক্ত শিরোনামার তাৎপর্য্য এই যে—ঈমান যেহেতু একটি আন্তরিক বস্তু, ইহা কোনও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা অর্জিত হয় না, তাই বলিয়া এরূপ ধারণা করাও নিতান্ত ভুল হইবে যে, ঈমান হাসিল করার ব্যাপারে মানুষের নিজস্ব কিছু করণীয় বা চেষ্টা চরিত্রের প্রয়োজন নাই। বরঞ্চ, প্রকৃত প্রস্তাবে ঈমান একটি প্রধান "আমল"। আমল কাহাকে বলা হয়? আল্লাহ তায়ালা মানুষকে বিবেচনা শক্তি দান করিয়াছেন এবং আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি পরিচালনার দ্বারা সকল প্রকার কার্য্যানুষ্ঠানের জন্য কর্মশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ আভ্যন্তরীণ বা বাহ্যিক কোনও অঙ্গের দ্বারা কোনও কার্য্য সমাধা করাকেই আমল বলে। এতদৃষ্টে ঈমানও একটি আমল। কারণ, ঈমানের উৎপত্তিস্থল "কল্‌ব" অর্থাৎ দেল বা অন্তকরণ। কল্‌ব মানুষের একটি আভ্যন্তরীণ অঙ্গ। মানুষ স্বীয় বিবেচনাশক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কর্মশক্তি প্রয়োগ করতঃ চেষ্টা ও সাধনা করিয়া তাহার কল্‌ব অঙ্গের দ্বারা ঈমান রত্ন অর্জন করিতে পারে। বরং এরূপ চেষ্টা ও সাধনা দ্বারা অর্জিত ঈমানকেই শরীয়তে উত্তম ঈমান গণ্য করা হয়। সুতরাং ঈমান নিছক একটি ঐচ্ছিক ও অর্জনীয় আমল, শুধু তাহাই নহে বরং সর্বপ্রধান আমল।

কারণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত ধর্মীয় কার্য্যাবলী ঈমানেরই ডাল-পালা ও শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। ঈমানের মূল ও শিকড় অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রোথিত এবং উহার শাখা-প্রশাখা সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রসারিত ও পরিব্যাপ্ত। সেই জন্যই নাজাতকামীদের কর্তব্য হইবে সর্বদা মূল ঈমানের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সমবায়ে উহাকে সরস, সতেজ ও শ্যামল রাখার প্রতি যত্নবান হওয়া। আলোচ্য শিরোনামার বিষয়টির প্রমাণে কতিপয় কোরআনের আয়াত ও একটি হাদীছ উল্লেখ করা হইতেছে।

প্রথম আয়াত :—وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"(আল্লাহ তায়ালা বেহেশতীদিগকে জাগতিক জীবনে তাহাদের কৃত সাধনার প্রতি সন্তুষ্টির স্বীকৃতি স্বরূপ বলিবেন, (হে বেহেশতবাসী!) তোমাদিগকে এই বেহেশতের দ্বারা পুরস্কৃত করা হইয়াছে তোমাদের কৃত আমলের বদৌলতে। (২৫ পাঃ ১৩ রুঃ)

এখানের আমল দ্বারা ঈমানকেও বুঝাইয়াছে, বরং বেহেশতের অধিকারী হইবার জন্য ঈমানই সর্ব প্রধান নির্ভরস্থল। যদি ইহা ইচ্ছাকৃত চেষ্টা ও সাধনার দ্বারা অর্জিত না হইত, তবে ইহার উপর প্রতিদান বা পুরস্কার কিরূপে হইতে পারে?

দ্বিতীয় আয়াত :—فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

"আল্লাহ তায়ালা শপথ করিয়া বলিতেছেন, তাহারা (মানব) জীবনভর কি আমল করিতেছিল সে সম্বন্ধে তাহাদিগকে নিশ্চয় জিজ্ঞাসাবাদ করিব এবং বিচার করিব। (১৪পাঃ ৬রুঃ)

অনেক ইমামগণ এখানে "আমল" শব্দের উদ্দেশ্য ঈমান বলিয়াছেন—অর্থাৎ প্রত্যেক মানবকে জিজ্ঞাসা করা হইবে যে, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু—"মাবুদ বা উপাস্য একমাত্র আল্লাহ, তিনি ভিন্ন কোনও মাবুদ নাই"—এই স্বীকারোক্তি ও অঙ্গীকার-বাক্যের উপর সে পূর্ণরূপে আমল করিয়াছে, না অন্য কাহাকেও মাবুদ বানাইয়া সে অনুযায়ী জীবন-যাপন করিয়াছে।

উল্লেখিত জিজ্ঞাসা বস্তুটিই ঈমান; ঈমান মানুষের ইচ্ছা ও অর্জন-ক্ষমতাভুক্ত না হইলে উহার জন্য প্রশ্ন করা হইবে কেন; কেনই বা সে উহার জন্য দায়ী হইবে?

২৩। হাদীছ :—আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের খেদমতে আরজ করা হইল, সর্বোৎকৃষ্ট আমল কি? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লাহ এবং আল্লাহর রসুলের প্রতি খাঁটী বিশ্বাস স্থাপন করা—অর্থাৎ ঈমান। পুনরায় আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, আল্লার রাস্তায় জেহাদ করা। আবার আরজ করা হইল—তারপর? হযরত (দঃ) বলিলেন, এরূপ (আদব, মহব্বৎ, ভক্তি, ভজনা ও সাধনার সহিত) হজ্জ করা যাহা আল্লার দরবারে গ্রহণযোগ্য হয়।

এই হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—জেহাদ, হজ্জ ইত্যাদির ন্যায় ঈমানও একটি আমল, বরং সর্বশ্রেষ্ঠ আমল—যাহা যথোপযুক্ত চেষ্টা ও সাধনায়ই হাসিল হইতে পারে।

খাঁটী ও অখাঁটী ইসলামের বিশ্লেষণ

যদি খাঁটীভাবে সর্বান্তকরণে ইসলামকে গ্রহণ করা না হয়, শুধু আত্মরক্ষামূলক বা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাহ্যিক দলভুক্তি ও আনুগত্য দেখান হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ ইসলামের আদৌ কোনও মূল্য হইবে না। এরূপ ইসলামের নামধারী ব্যক্তি মোমেন হওয়ার দাবীও করিতে পারে না, তাহাকে মোমেন বলিয়া আখ্যায়িতও করা যাইবে না।

পবিত্র কোরআনেই আছে—

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ -

অর্থাৎ :—একদল গ্রাম্যলোক যাহাদের অন্তরে ঈমান ছিল না, শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি ও লোক দেখানো ভাবে কিছু বাহ্যিক আমল তাহারা করিত; তাহারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট আসিয়া ঈমানের দাবীদার হইল। আল্লাহ তায়া। এই আয়াতে রসুলুল্লাহ (দঃ)কে আদেশ করিলেন, "আপনি তাহাদিগকে বলুন, তোমরা মিথ্যাবাদী—তোমরা ঈমানদার হও নাই; তবে হাঁ, প্রকাশ্যে ইসলামের আনুগত্য দেখাইতেছ, এইটুকু দাবী করিতে পার। এখনও তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করে নাই। (২৬ পাঃ ১৪ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হইল - পার্থিব লোভ, স্বার্থোদ্ধার বা ভয় ইত্যাদির দরুণ মৌখিক স্বীকারোক্তি ও বাহ্যিক আমলের ইসলাম আল্লার নিকট মূল্যহীন হইবে।*

---

* বর্তমান কালের ধর্ম বিবর্জিত শিক্ষা ও বিধর্মীয় সভ্যতার অনুকরণ-প্রিয়তার যুগে এক প্রকার মোসলমানের আবির্ভাব হইয়াছে, যাহারা শুধু বংশগত ভাবেই মোসলমান। অর্থাৎ মোসলমান পূর্বপুরুষ ও মুসলিম বাপ দাদার ঔরষজাত হিসাবে মোসলমান বলিয়া পরিচিত। সামাজিক বাধ্য বাধকতা বা শুধু স্ফূর্তি উপভোগ ও দলভুক্তি হিসাবে ঈদ, কোরবাণী ইত্যাদি এমনকি, হজ্জ-যাত্রার ন্যায় মোসলমানদের বাহ্যিক ধর্মানুষ্ঠানাদিতেও যোগদান করে, কিন্তু স্বীয় বিবেচনাশক্তি দ্বারা পরিচালিত ও উদ্বুদ্ধ হইয়া এরূপ মনোবল ও দৃঢ়তা অর্জন করে নাই যে, একমাত্র আল্লাহ প্রদত্ত মতবাদ ও আল্লার মনোনীত ধর্ম ইসলাম গ্রহণীয় বিধায় আমি সর্বান্তকরণে উহাকেই গ্রহণ করিতেছি এবং অন্য সমস্ত মতবাদ বর্জনীয়, অতএব আমি সে সব বর্জন করিতেছি। এহেন বংশানুক্রমিক মোসলমানদের সতর্ক হওয়া এবং উক্ত আয়াতের মর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখা কর্তব্য।

মদীনার ঐ গ্রামবাসী মোনাফেকের দল যাহারা কেবল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার উদ্দেশ্যে ইসলাম ও ঈমানের দাবী করিয়া থাকিত, কিন্তু তাহাদের উপর প্রকৃত প্রস্তাবে ইসলাম ও ঈমানের কোনই প্রভাব ছিল না এবং ইসলামের প্রতি তাহাদের প্রকৃত শ্রদ্ধাও ছিল না। পক্ষান্তরে তাহারা ইসলামকে অচল হেয় মনে করিত, এমনকি খাঁটি মোসলমানদিগকে বোকা, নির্বোধ ইত্যাদি বলিয়া বিদ্রূপ ও উপহাস করিতেও দ্বিধা বোধ করিত না। এই সকল মোনাফেক মোসলমানীর দাবী-

(অপর পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাহ্যিক স্বীকারোক্তি ও আমলের সঙ্গে সঙ্গে খাঁটীভাবে আন্তরিক বিশ্বাস স্থাপন ও নিষ্ঠার সহিত ইসলামের যাবতীয় অনুশাসনকে গ্রহণ করার দৃঢ় প্রস্তুতি থাকিলে সেই ইসলামই আল্লার নিকট গ্রহণীয় হইবে। একমাত্র এই প্রকার ইসলামকে উদ্দেশ্য করিয়াই কোরআনের ঘোষণায় রহিয়াছে—إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ "আল্লার মনোনীত ধর্ম একমাত্র ইসলাম" (৩ পাঃ ১০ রুঃ)। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তিতে এই আয়াতের উদ্দেশ্য হাসিল হইবে না।

২৪। **হাদীছ ঃ**—ছাহাবী সায়া'দ (রাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট বসিয়াছিলাম, তিনি একদল লোককে দান করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে এমন একজন লোককে তিনি কিছুই দিলেন না, যাহাকে আমি ঐ দলের মধ্যে সর্বোত্তম (দ্বীনদার-পরহেজগার) বলিয়া মনে করিতাম। এতদৃষ্টে আমি আরজ করিলাম—ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! আপনি অমুক ব্যক্তিকে দান করিলেন না? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সে "মোমেন"। রসুলুল্লাহ (দঃ) বলিলেন, (এরূপ দৃঢ়ভাবে) "মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। আমি কিছু সময় চুপ করিয়া রহিলাম, কিন্তু আমার মনে ঐ খেয়াল ও ধারণা আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আমি পুনরায় ঐরূপ বলিলাম; তিনিও পুনরায় ঐরূপই বলিলেন—"মোমেন" বলিও না, "মোসলেম" বল। তৃতীয়বার ঐরূপ প্রশ্ন করিলে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিলেন—হে সায়া'দ। (অনেক সময়) আমি অপছন্দনীয় ব্যক্তিকেও দান করি শুধু এই কারণে যে, (তাহার ঈমান এখনও দুর্বল;) আমার আশঙ্কা হয় (তাহাকে দান করিয়া স্বচ্ছল না রাখিলে অভাবে পড়িয়া) সে হয়ত (ইসলাম ত্যাগ পূর্বক) দোযখের পথে চলিয়া যাইতে পারে।×

দারদের সহিত বর্তমান যুগের নামধারী বংশগত মোসলমানদের তুলনা করিলে মোটেই অতিরঞ্জিত বা অন্যায় হইবে না। কারণ, ইহারা শুধু যুগ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী রাজনৈতিক, সামাজিক, পঞ্চায়েতী নেতৃত্ব ও পদ-মর্যাদা ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক স্বার্থ সমূহকে এই বিরাট মোসলেম সমাজের নিকট হইতে নিজেদের কুক্ষিগত করার জন্য নিজেদেরকে মোসলেম সমাজের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়। পক্ষান্তরে ইসলামের কোনও প্রভাবই তাহাদের উপর নাই এবং ইসলামের প্রতি কোনরূপ দরদ, শ্রদ্ধা দৃঢ়তা বা একীন তাহাদের অন্তরে নাই।

× কোনও ব্যক্তিকে দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী তাহার মন রক্ষা করিয়া চলাকে শরীয়তের পরিভাষায় "তালীফে-কুলুব" বলা হয়। শরীয়তে এরূপ মনস্তুটি বিধান করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। কারণ, ঈমান-রত্নের বিকাশ সকলের অন্তরেই মাত্র এক দুই দিনেই হইয়া যায় না। খাঁটি মোমেনদের সংশ্রবে থাকিলে পর্যায়ক্রমে উহা হাসিল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সে জন্যই ঐরূপ ব্যক্তির সন্তুষ্টিবিধান করতঃ তাহাকে ঈমানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার সুযোগ দান করা বিধেয়।

ব্যাখ্যা ঃ—"মোমেন" শব্দের অর্থ ঈমানদার। খাঁটীভাবে ভয় ও ভক্তির সহিত বিশ্বাস করতঃ সেই বিশ্বাসানুপাতিক জীবন যাপনের আন্তরিক প্রস্তুতি মনেপ্রাণে গ্রহণ করাকে ঈমান বলা হয়। ইহা কোনও বাহ্যিক অথবা দৃশ্য বস্তু বা ক্রিয়া নহে। ভয়, ভক্তি, বিশ্বাস ও আন্তরিক প্রস্তুতি এ সবই অন্তরের অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য অবস্থা এবং প্রতিক্রিয়া ও গুণাগুণ বিশেষ—যাহা বাহ্যদৃষ্টির আওতাভুক্ত নহে। অতএব কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নিশ্চিতরূপে "মোমেন" বলার অধিকার অন্তর্যামী আল্লারই থাকিতে পারে। অন্য কেহই এই অধিকার পাইতে পারে না।

"মোসলেম" অর্থ ইসলাম গ্রহণকারী। শরীয়তের আদেশ-নিষেধ, হুকুম-আহকামের প্রতি স্বীকারোক্তি ও ঐগুলিকে বাহ্যতঃ পালন করার নাম "ইসলাম"। ইহা অবশ্যই কতকগুলি প্রকাশ্য ক্রিয়া-কলাপ এবং বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টিবিশেষ। তাই ইহার উপর ভিত্তি করিয়া পরস্পর একে অন্যকে দৃঢ়তার সহিতও "মোসলেম" বলিতে পারে।

সায়া'দ (রাঃ) তাঁহার পছন্দনীয় ব্যক্তিকে শপথ করিয়া দৃঢ়তার সহিত "মোমেন" বলিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার অনধিকার চর্চা ছিল—কারণ, কোনও ব্যক্তিবিশেষকে এরূপ দৃঢ়ভাবে মোমেন বলার অধিকার আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাহারও হইতে পারে না। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম সায়া'দ (রাঃ)কে বাধা দান করিয়া বলিলেন—অদৃশ্য ও অন্তকরণ সম্পর্কিত ব্যাপারে এরূপ দৃঢ়তা প্রকাশ এবং সাব্যস্তমূলক উক্তি করা বাঞ্ছনীয় নহে। হয়ত ঐ ব্যক্তি অন্তরে অন্য ভাব পোষণ করিয়া থাকিতে পারি। তবে হাঁ তাহার প্রতি তোমার ভাল ধারণা থাকিলে তুমি তাহাকে দৃঢ়ভাবেও মোসলেম বলিতে পার। কারণ, ইসলাম কোনও অন্তঃস্থলীয় অদৃশ্য বস্তু নহে, উহার অনুভূতি মানুষের প্রকাশ্য দৃষ্টির আওতাভুক্ত।

পাঠকবর্গ! এখানে একটি বিষয় স্মরণ রাখিবেন যে—"মোমেন" ও "মোসলেম" শব্দদ্বয়ের মূল "ঈমান" ও "ইসলামের" মধ্যে পার্থক্য প্রদর্শন এবং এই দুইটির ব্যবহারিক তাৎপর্য্য ও বিশ্লেষণ উপলব্ধি করানো—ইহাই ছিল রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের বাধাদানের উদ্দেশ্য। নতুবা যে ব্যক্তি সম্পর্কে এই কথাবার্তা হইতেছিল তিনি অতি বড় মর্তবার ছাহাবী ছিলেন। তাঁহার নাম ছিল—জোয়াইল (রাঃ)। অন্য স্থানে স্বয়ং নবী (দঃ) তাঁহার বহু ফজিলত বর্ণনা করিয়াছেন।

আলোচ্য হাদীছ দ্বারা দেখান হইল যে, অর্থাটী ইসলামের দ্বারা "মোমেন" আখ্যা লাভ করা ত দূরের কথা খাঁটি ইসলাম ক্ষেত্রেও "মোমেন" আখ্যার ব্যবহার অত্যন্ত সতর্কতা সাপেক্ষ।

ব্যাপকভাবে সালাম জারী করা ঈমানের একটি শাখা

বিশিষ্ট ছাহাবী আম্মার (রাঃ) বলিয়াছেন—তিনটি স্বভাবকে যে আয়ত্ব করিতে পারিবে সে সর্বাঙ্গীন ঈমানের অধিকারী হইবে। (১) নিজ হইতেই নিজের ইনসাফ করা, অর্থাৎ

নিজের উপর আল্লার বা বান্দাদের যে হক আছে, প্রত্যেকটি হক কাহারও দাবী ব্যতিরেকেই পূর্ণরূপে আদায় করা। (২) পরিচিত অপরিচিত সকলকে সালামঃ করা। (৩) গরীব হওয়া সত্ত্বেও সামর্থ্য অনুযায়ী সৎকাজে দান করা।

ইমাম বোখারী (রঃ) আলোচ্য শিরোনামায় ১১ নং হাদীছটি উল্লেখ করিয়াছেন।

কুফরের শাখা-প্রশাখা পরস্পর ছোট-বড় হয়

অর্থাৎ :—যেমন নেক কাজসমূহ ঈমানের শাখা-প্রশাখা এবং উহা পরস্পর ছোট-বড় হয়, তদ্রূপ গোনাহের কাজসমূহ কুফরের শাখ-প্রশাখা এবং উহাও পরস্পর ছোট-বড় হয়।

এখানে আরও একটি কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে—যেমন আল্লার হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকে কুফরের শাখা বলা যায়, তেমনি কোন মানুষের হক আদায় না করাও গোনাহ, তাই উহাকেও কুফরের শাখা বলা যাইবে।

২৭। **হাদীছ :**—ইবনে আব্বাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন, আমাকে দোযখ দেখানো হইয়াছে। তখন আমি দেখিয়াছি—দোযখীদের অধিকাংশই নারী। কারণ, তাহারা "কুফরী" বেশী করিয়া থাকে। জিজ্ঞাসা করা হইল, তাহারা কি আল্লার কুফরী করিয়া থাকে? নবী (দঃ) উত্তরে বলিলেন, স্বামীর কুফরী (অর্থাৎ না-শোকরী ও নেমক-হারামী) এবং এহ্সান ও উপকারের কুফরী করিয়া থাকে। নারী জাতির স্বভাব এই যে, যদিও তুমি তাহার প্রতি আজীবন এহ্সান, সদ্ব্যবহার ও উপকার কর, কিন্তু তোমার কোনও একটি মাত্র ত্রুটির সে (সব কিছু ভুলিয়া গিয়া তোমার সকল উপকার অস্বীকার করতঃ) বলিবে—আমি জীবনে কখনও তোমার নিকট হইতে সদ্ব্যবহার পাইলাম না।

এখানে ইমাম বোখারী (রঃ) আবু সায়ীদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন, ঐ হাদীছটি "ঋতু অবস্থায় রোযা রাখিতে পারিবে না" শিরোনামায় বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইবে। সেই হাদীছে নারী জাতির আরও দুইটি মারাত্মক দোষের কথা উল্লেখ হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি হইল যে—নারী জাতি স্বভাবতঃ কথায় কথায় অভিশাপ ও তিরস্কার অত্যন্ত বেশী করিয়া থাকে। আর দ্বিতীয়টি হইল এই যে, নারী স্বভাবতঃই অতি ছলনাময়ী হইয়া থাকে। হযরত রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলেন—নারী জাতি সাধারণতঃ পুরুষ অপেক্ষা তরলমতি ও অল্প বুদ্ধিসম্পন্না হইয়াও শুধু ছলনার দ্বারা অতিশয় হুশিয়ার, চালাক চতুর পুরুষের বুদ্ধিকেও ঘোলাটে করিয়া দিতে সর্বাধিক পটু দেখা যায়।

পাঠকবর্গ! আলোচ্য বর্ণনা দ্বারা নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য নহে। বরং নারী জাতির ত্রুটি সংশোধন ও চরিত্র গঠন করাই একমাত্র উদ্দেশ্য। রসুলুল্লাহ

ঃ মৌখিক সালামের সঙ্গে সঙ্গে কার্য্যতঃ সালাম তথা শান্তিও দান করা চাই।

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের শিক্ষা ও আদর্শ জাতি গঠন ও জাতীয় চরিত্র সংশোধনে অতি ব্যপক ও সুদূরপ্রসারী। হযরত (দঃ) জাতীর ক্ষুদ্রতম ছিদ্র পথেও প্রবেশ করতঃ উহার গলদ দুর করার প্রতি তৎপর হইয়াছেন এবং জাতিকেও তদনুযায়ী শিক্ষা দান করিয়াছেন। নারী জাতির উপরই সংসারের সুখ-সমৃদ্ধি, শান্তি ও শৃঙ্খলা সব কিছু নির্ভর করে। তাহাদের ছলনায়, তাহাদের অভিশাপ ও ভর্ৎসনার দাপটে এবং তাহাদের না-শোকর-গোজারীপূর্ণ কর্কশ ব্যবহার বহু স্বামীর সুখের সংসার নরকে পরিণত হয়। অনেক সময় ইহার বিষময় ফলাফল ও বিধ্বংসী পরিণতি ভয়াবহ আকার ধারণ করে। তাই রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম এই ভয়াবহতার মুল কারণ—উপরোক্ত দোষগুলির প্রতি সংস্কারের অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়াছেন। এমনকি, ঐ দোষগুলিকে অত্যন্ত কঠোর শব্দ "কুফর" বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। ইহা তাঁহার অপরিসীম দুরদর্শিতারই পরিচায়ক।

প্রত্যেকটি গোনাহ কুফুরীর শাখা

অর্থাৎ গোনাহ যত ছোটই হউক না কেন, উহাকে মামুলী গণ্য করা চাই না এবং উহা হইতে দুরে থাকিবার প্রতি তৎপর হওয়া চাই। কারণ, উহা কুফুরীর একটি শাখা। যেরূপভাবে প্রত্যেকটি নেক আমলকে ঈমানের শাখা বলা হইয়াছে।

গোনাহ সমূহ কুফুরীর শাখা ও কুফুরী যুগের প্রথা হওয়া সম্পর্কে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নাই। কিন্তু শুধু কুফুরীর শাখা-প্রশাখা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন কোনও ব্যক্তিকে "কাফের" বলা যাইবে না—যে পর্য্যন্ত না সে আল্লার, আল্লার রসুলের বা আল্লার বাণীর প্রতি স্বীকারোক্তি হানিকর কোনও কাজ বা উক্তি করিবে। তবে হাঁ, সাধারণ গোনাহ সমূহের অনুষ্ঠানকারী কাফের সাব্যস্ত না হইলেও তাহার মধ্যে কুফুরীর শাখা আছে বলিতে হইবে। যেমন, বলা হয়—সে চোর না হইলেও চোরাই মাল তাহার ঘরে আছে।

কুফুরীর শাখা-প্রশাখা—গোনাহসমূহ মাফ হওয়ার উপযোগী। অর্থাৎ তওবা ইত্যাদির দ্বারা মাফ হয়। কিন্তু আসল কুফর ও শেরক আল্লাহ তায়ালা কখনও মাফ করিবেন না। উহা বর্জন পুর্বক ইসলাম গ্রহণ করিলেই উহা মাফ হইতে পারে; উহা মাফ হইবার অন্য কোন উপায় নাই। এ সম্বন্ধে কোরআন শরীফে সুস্পষ্ট ঘোষণা রহিয়াছে। (৫ পাঃ ১৫ রু)।

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

অর্থ:—আল্লার সঙ্গে শরীক করা (অংশীদবাদিতা ইহা) আল্লাহ কিছুতেই মাফ করিবেন না। তাহা ছাড়া অন্যান্য বিষয় আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছা করিবেন মাফ করিবেন।

এই আয়াতে শুধু শেরেকই উল্লেখ আছে, কিন্তু কুফরও তদ্রূপই অক্ষমার্হ। কারণ, বস্তুতঃ শেরেক ও কুফর পরস্পর বিজড়িত। "শেরক" অর্থ কাহাকেও আল্লাহকে, আল্লার রসুলকে বা আল্লার বাণীকে অস্বীকার করা। আল্লার সঙ্গে কাহাকেও শরীক করা হইলে সে ক্ষেত্রে আল্লাকে অস্বীকারই করা হয়, কারণ প্রকৃত পক্ষে যিনি আল্লাহ তিনি ত

ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু— তিনি এক, অদ্বিতীয় তাঁহার কোন শরীক বা দোসর নাই। তদ্রূপ আল্লাহ, আল্লার রসুল, আল্লার বাণীকে অস্বীকার করিলেও নিশ্চয় অন্যকে আল্লার সঙ্গে শরীক করা হইয়া থাকে। কারণ, কোনও লোক যখন আল্লার অস্তিত্বকে বা রসুলের ও কোরআনের সত্যতাকে অস্বীকার করে, তখন সে নিশ্চয়—হয়ত অন্য কাহারও অনুকরণে উহা করে কিম্বা স্বীয় প্রবৃত্তির বশে উহা করিয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাও আল্লার সঙ্গে শরীক করারই নামান্তর। কেননা, মানুষ বিনাশর্তে বশ্যতা স্বীকার করিবে, ইহা একমাত্র আল্লারই সার্বভৌম অধিকার। অথচ ঐ ব্যক্তি আল্লার সেই অলঙ্ঘনীয় অধিকার অন্য মানুষকে বা স্বীয় প্রবৃত্তিকে অর্পন করিয়াছে, তাই এক্ষেত্রেও শেরক্ করা হইল।

এখানে ইহাও প্রকাশ পায় যে, প্রতিটি গোনাহ শেরকেরও শাখা, তাই গোনাহকে অন্ধকার যুগের কাজ বলা হইবে। কারণ, প্রতিটি গোনাহে স্বীয় প্রবৃত্তির বশ্যতা থাকে; অথচ মানবের কর্তব্য হইল—একমাত্র আল্লার বশ্যতায় চলা। ইহারই ইঙ্গিত এই আয়াতে রহিয়াছে—

أَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۔ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

"হে রসুল! বলুন ত—যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তিকে মাবুদ বানাইয়াছে। আপনি লইতে পারেন কি তাহার সংশোধনের দায়িত্ব?" (১৯ পাঃ ২ রুঃ)।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় প্রবৃত্তির দাসত্ব করিয়া চলিয়াছে, তাহাও সৃষ্টিকর্তাপালনকর্তার বিরুদ্ধাচরণে তাহার সংশোধন হইবে কিরূপে?

২৬। **হাদীছ**ঃ—আবুযর গেফারী ছাহাবীর শাগেরদ মা'রুর (রঃ) বর্ণনা করেন—একদা আমি আবুযর গেফারীর (রাঃ) সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া দেখিলাম, তাঁহার পরিধানে একজোড়া কাপড় এবং তাঁহার ক্রীতদাসের পরিধানেও অবিকল ঐরূপ একজোড়া কাপড়। আমি তাঁহাকে ভৃত্যের সহিত এরূপ সমতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন, একদা আমি আমার ভৃত্যকে গালি দিতে বাঁদীর বাচ্চা বলিয়া গালি দিলাম। রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম শুনিয়া বলিলেন, হে আবুযর! তাহাকে তাহার মাতার সঙ্গে জড়াইয়া গালি দিতেছ? তোমার মধ্যে কুফরী যুগের স্বভাব রহিয়াছে। হযরত (দঃ) আরও বলিলেন—

إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ

فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ

فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ

"এই সব ক্রীতদাস (বা ভৃত্যগণ) তোমাদেরই ভাই। আল্লাহ তায়ালা তাহাদিগকে তোমাদের করতলগত করিয়াছেন। অতএব, যে কোনও মোসলমানের অধীনে তাহারই

অন্য এক ভাই (তথা তাহারই মত একজন মানুষ ভৃত্য শ্রমিক বা ক্রীতদাস রূপে) থাকিবে; সেই মোসলমানের কর্তব্য হইবে—ঐ ভাইকেও তদ্রূপই খাওয়ানো, পরানো যদ্রূপ সে নিজে খাইয়া ও পরিয়া থাকে। আর সাবধান! তোমরা কখনও ঐ ভাই এর উপরে এতদূর গুরুভারের কাজ চাপাইয়া দিও না, যাহা তাহার সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি কখনও এরূপ কোন কাজ তাহার দ্বারা করাইতে হয়, তবে তোমরা নিজেরাও ঐ কাজে তাহার সাহায্য করিবে।"

ব্যাখ্যা ঃ—আবুযর (রাঃ) নবীজীর উক্ত আদেশের পূর্ণ আনুগত্যে স্বীয় ভৃত্যকে নিজের সহিত পূর্ণ সমতা দান করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার ভাবাবেগ ও নবীজীর আনুগত্যে চরম উৎসর্গ-প্রীতি ছিল। নতুবা অন্যান্য দলীল-প্রমাণে সাব্যস্ত হয় যে উক্ত আদেশটির মূল উদ্দেশ্য সমতা নয়, বরং উদারতা (ফতহুল বারী)।

বোখারী শরীফেরই এক হাদীছে আছে—তোমার ভৃত্য তোমার জন্য খাবার তৈরী করিলে উহা হইতে অন্ততঃ এক গ্রাস তাহাকেও দিও।

২৭। হাদীছ ঃ— عن ابى بكرة رضى الله تعالى عنه

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ قَالَ اِنَّهٗ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ -

অর্থ ঃ—আবু বক্‌রাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম বলিয়াছেন—দুই দল মোসলমান যখন তরবারি হাতে লইয়া পরস্পর ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই দোযখের উপযুক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়া যায়। আমি আরজ করিলাম, ইয়া রসুলাল্লাহ (দঃ)! হত্যাকারী ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে ইহা বোধ-গম্য, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দোযখের উপযুক্ত হইবে কেন? হযরত (দঃ) উত্তরে বলিলেন—কারণ, নিহত ব্যক্তিও যখন তরবারি হাতে লইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়াছিল, তখন তাহারও ইচ্ছা এই ছিল যে, সে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিবে, (সুতরাং সেও দোযখেরই উপযুক্ত)।

এই হাদীছের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, মোসলমানদের পরস্পর লড়াই-ঝগড়া করা কুফরীর একটি শাখা, তাই এই কাজের পরিণাম ফল উভয়ের জন্যই দোযখ। অন্য এক হাদীছে স্পষ্টতঃই উল্লেখ আছে—سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَّقِتَالُهٗ كُفْرٌ

"মুসলমান মুসলমানকে গালি দিলে গালিদাতা ফাছেক হইয়া যায় এবং মুসলমান মুসলমানের বিরুদ্ধে লড়াই করিলে তাহা কুফরী কাজ বলিয়া পরিগণিত হয়।"

তবে এখানেও সেই পূর্বোল্লিখিত বিধানটি প্রযোজ্য হইবে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তিকে কুফরী অনুষ্ঠানকারী, কুফুরীর শাখা প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইবে। কাফের বলা যাইবে না। বোখারী (রঃ) ইহার প্রমাণে কোরআন শরীফের একটি আয়াত উদ্ধৃত করিয়াছেন—

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ـ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ

অর্থ :—যদি মোমেন-মুসলমানদের মধ্য হইতে দুইটি দল পরস্পর লড়াই-ঝগড়ায় ব্যাপৃত হইতে উদ্যত হয়, তবে (হে মোসলেম জাতি! তোমাদের প্রতি আমার আদেশ এই যে—তদবস্থায় তোমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিও না বা গোপনে উস্কানি দিও না অথবা তাহাদের বিপদ দেখিয়া মনে মনে আত্মতুষ্টি লাভ করিও না, বরং) তোমরা তাহাদের উভয়ের মধ্যে ছোলেহ (মীমাংসা) ও পুনর্মিলন সৃষ্টি করিয়া দাও। তোমাদের মীমাংসা-চেষ্টা সত্ত্বেও যদি তন্মধ্যে একদল অন্য দলের উপর অত্যাচার করে, তবে তোমরা সকল মুসলমান একতাবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ও আক্রমণকারী দলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া তাহাদিগকে আল্লার আদেশের (তথা মীমাংসা ও পুনর্মিলনের) প্রতি মাথা নত করিতে বাধ্য কর। (২৬ পাঃ ১৩ রুঃ)

এই আয়াতে প্রমাণিত হয় যে, দুই দল মুসলমানের যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হওয়া কুফুরী কাজ এবং কুফ্রীর শাখা হওয়া সত্ত্বেও ইহার দ্বারা ঈমান একেবারে বিনষ্ট হইবে না। খাঁটী তওবা করিয়া প্রত্যাবর্তনের সুযোগ থাকিবে এবং তাহাকে "কাফের" বলা যাইবে না। কারণ, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধরত উভয় দলকেই মোমেন বলিয়াছেন।

২৮। **হাদীছ** :—ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন, যখন এই আয়াত নাজিল হইল—

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ

"যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং কোন প্রকার অন্যায়-অত্যাচার করে নাই, একমাত্র তাহারাই পরিত্রাণ পাওয়ার যোগ্য (৭ পাঃ ১৫ রুঃ)। তখন ছাহাবীগণ ভাবিলেন—আমাদের প্রত্যেকেরই কম-বেশী কিছু অন্যায়-অত্যাচার (অর্থাৎ গোনাহ) নিশ্চয়ই আছে; তাহা হইলে এই আয়াতের মর্মানুসারে দেখা যাইতেছে, আমরা কেহই পরিত্রাণ পাইতে পারি না। এই ভাবিয়া তাঁহারা (ভীত ও চিন্তিত হইয়া রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লামের নিকট) আরজ করিলেন—আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে কোন একটিও অন্যায়-অত্যাচার (গোনাহ) করে নাই? রসুলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে অসাল্লাম তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন—এই আয়াতে (যুল্‌ম শব্দটির দ্বারা) সাধারণ অন্যায়-অত্যাচার বা সাধারণ গোনাহ উদ্দেশ্য করা হয় নাই, বরং সব চেয়ে বড় অন্যায়-অত্যাচার "শেরক"কে